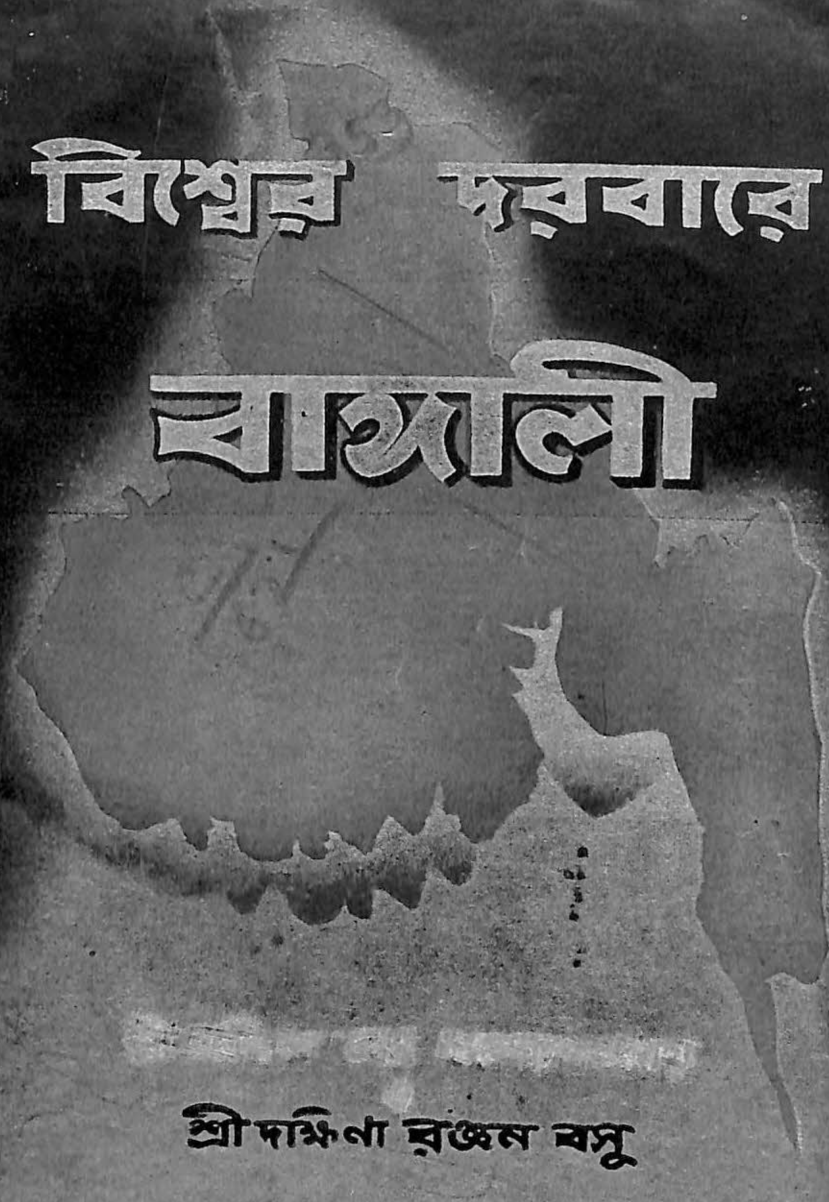
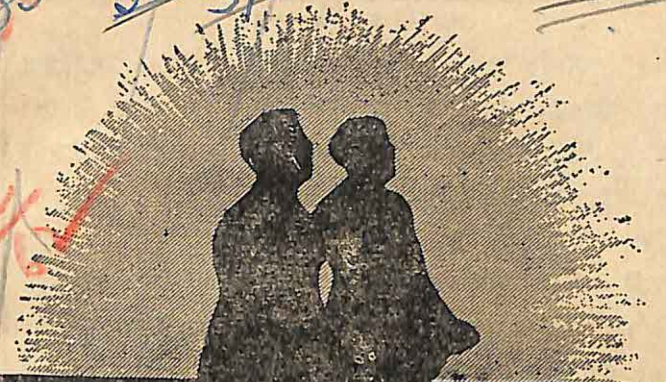
বিশ্বের দরবারে
বাঙালী



শ্রী দক্ষিণা রঞ্জন বসু



বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালী

“রাজা রামমোহন রায় হইতে নেতাজী স্থভাষচন্দ্র পর্যন্ত এগার জন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী যাঁহারা বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালীকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাঁহাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অপূর্ব্ব উদ্ভাসন”।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু বি. এ.
বার্ত্তাসম্পাদক, ‘যুগান্তর’

ষোড়শ সংস্করণ : এক টাকা চার আনা

এ. মুখার্জ্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ :: কলিকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

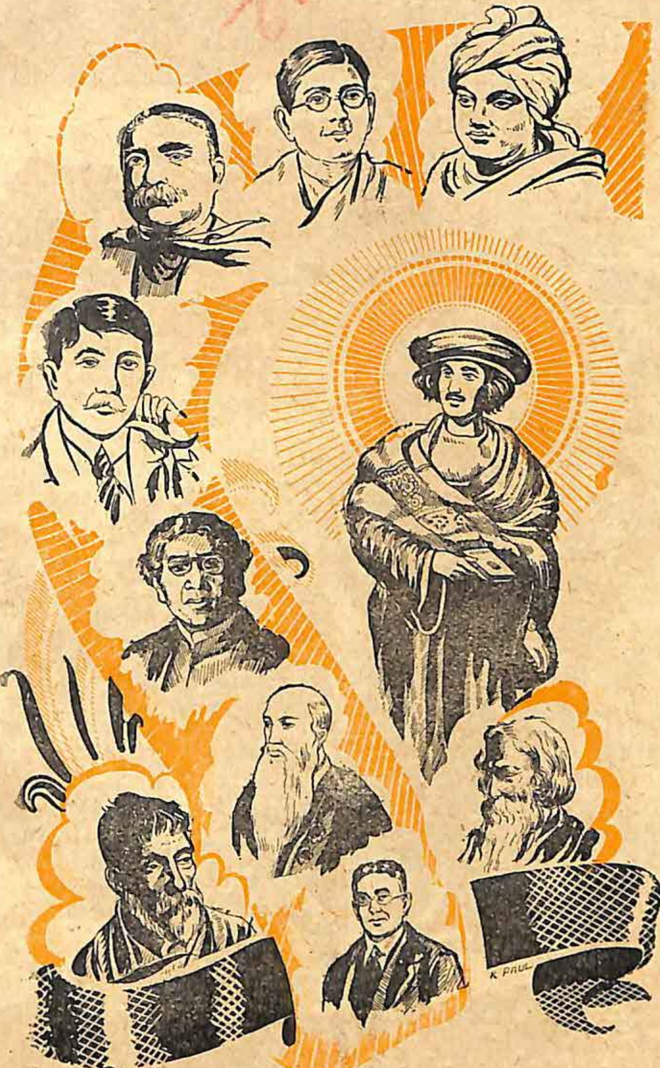
ক্ষুদ্র বাঙ্গালার সন্তান হইয়াও যাঁহারা তাঁহাদের যশঃসূর্য্যের উজ্জ্বল আলোকে দিগ্ দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া সুবিশাল বিশ্বের দরবারে গৌরবের আসন অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদেরই কয়েকজনের অভিনব ও উদ্দীপনাময় জীবন-কথা।

ইহাতে জন্মমৃত্যুর সন-তারিখ লইয়া গবেষণা করা হয় নাই, প্রত্যেকটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অতি সরল ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বৈশিষ্ট্যগুলি নাটকীয় দৃশ্যের মত চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

এই গ্রন্থের রচয়িতার পরিচয় দেওয়া বাহুল্যমাত্র। ইনি একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং সুপরিচিত কবি ও সাহিত্যিক। আশা করি ইহার সুনিপুণ লেখনী-নিঃসৃত এই পুণ্য জীবনকাহিনীগুলি ছাত্র-ছাত্রীগণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে।

প্রকাশক

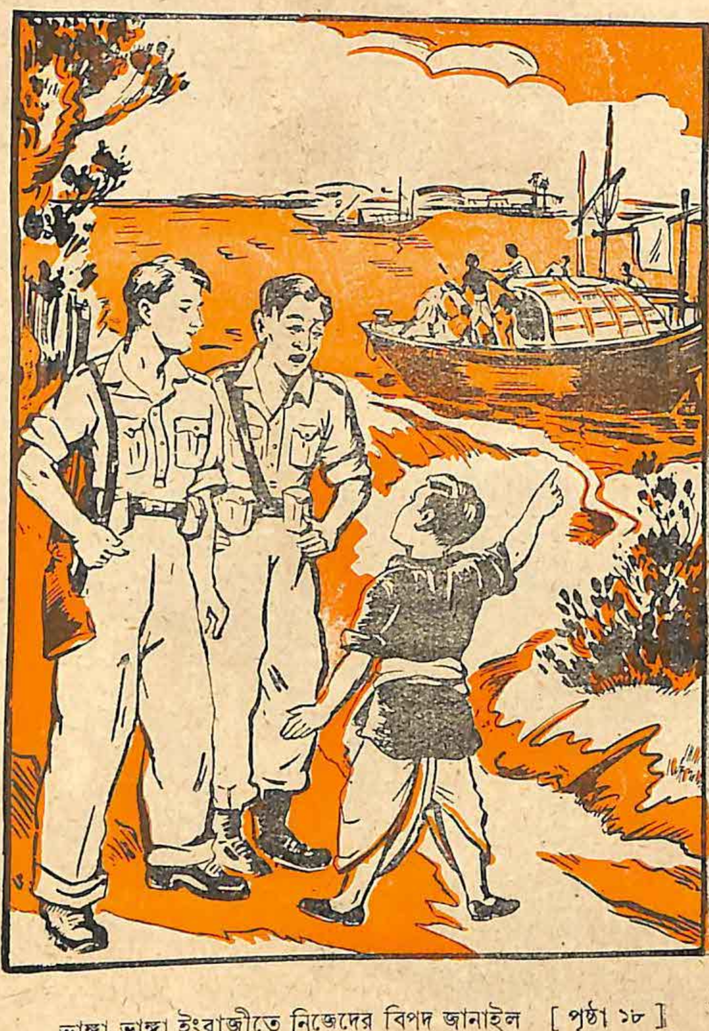
সূচীপত্র


K PAUL



নবীন ভারতের স্রষ্টা

মৃত স্বামীর জন্য চিতা সাজান হইয়াছে; সতী সাধ্বী স্ত্রী তাঁহার চোখে মুখে স্বর্গীয় দীপ্তি লইয়া সুন্দর সাজসজ্জা করিয়া স্বামীর চিতার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার পিছনে একদল সমাজপতি আর ব্রাহ্মণ। আর একদল লোকের হাতে ঢাক, ঢোল, দামামা! দেখিতে দেখিতে নানা শ্রেণীর লোক



ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে নিজেদের বিপদ জানাইল [পৃষ্ঠা ১৮]

সেখানে জড় হইল সেই দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইবার জন্য! অনেক মেয়েরাও আসিতেছেন—সেই সতীর কাণে কাণে তাঁহাদের কেহ কেহ বলিতেছেন, "স্বর্গে আমাদের যে সকল আত্মীয় আছেন তাঁদের প্রণাম জানিয়ো, প্রীতি জানিয়ো, তুমিও সুখে থেকো···" ইত্যাদি।

তারপর চিতায় আগুন জ্বালানো হইল। দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মৃত স্বামীর সঙ্গে সতী সাধ্বীকে জীবন্ত দগ্ধ হইতে দেখিয়া—তাহার জ্বলন্ত সৌভাগ্যে অনেক মেয়ে ঈর্ষ্যামিশ্রিত আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল।

ঠিক এই সময় জনৈক যুবক অদূরবর্ত্তী পথ ধরিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছেন। হঠাৎ এই দৃশ্য চোখে পড়িতেই তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। এইরূপ ঘটনার কথা তিনি তো আরও অনেক শুনিয়াছেন, প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তাঁহার মনে কখনও তো এমন করিয়া জিজ্ঞাসা জাগে নাই যে, সভ্য-জগতের মানুষ কি করিয়া এইরূপ নৃশংস ব্যবস্থার অনুমোদন করিতে পারে, কেমন করিয়া এই কুসংস্কারকে সহ্য করিতে পারে? যুবক এই সময় হইতেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে ভাবেই হউক এই নিষ্ঠুর প্রথার মূলোচ্ছেদ করিতেই হইবে এবং তিনি এই দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়াই সেদিন গৃহে ফিরিলেন।

এদিকে যে মেয়েটি স্বামীর চিতায় এই ভাবে আত্মদাহ করিলেন, তাঁহার আত্মীয় স্বজন অশেষ গৌরব বোধ করিতে লাগিলেন। সহমৃতা তরুণীর আর তাহার পরিজনদের প্রশংসায় চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। এই ছিল আগেকার

সতীদাহ প্রথা। আর যে মেয়ে এইভাবে আত্মদাহ করিতেন না, তাঁহাদের উপর সমাজ অমানুষিক উৎপীড়ন করিত; অন্নে ও বস্ত্রে তাঁহাদিগকে নানা প্রকারে বঞ্চিত রাখা হইত, স্বামীর প্রতি তাঁহারা অবিশ্বাসিনী বলিয়া গণ্য হইতেন।

অতি প্রাচীন কাল হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত ভারতীয় সমাজে প্রচলিত এই সতীদাহ প্রথার নিষ্ঠুরতা কোন কোন মনীষী ব্যক্তি যে উপলব্ধি করেন নাই তাহা নহে, কিন্তু কেহই এই নির্ম্মম কুসংস্কারের বিলোপ সাধনে কৃতকার্য্য হন নাই। এমন কি, পূর্ব্বে যে যুবকের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহার আগে এই অমানুষিক প্রথার বিরুদ্ধে বাংলায় তথা ভারতের কোথাও তেমন ব্যাপক আন্দোলন হয় নাই। এই যুবকই পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশের ঘুমন্ত জাতিকে অক্লান্ত পরিশ্রমে জাগাইয়া তুলিলেন এবং এই প্রথার কদর্য্যতা ও নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি করাইলেন। তিনিই প্রথম এই দিকে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন এবং একমাত্র তাঁহারই অতুলনীয় প্রয়াস ও প্রচারের ফলে অবশেষে এই বর্ব্বর সতীদাহ প্রথা রহিত হয়। ইনিই মহামনীষী রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন রায় শুধু যে সতীদাহ প্রথা নিবারণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, দেশকে অন্যান্য আরও অনেক কুসংস্কারের কুফল হইতে মুক্ত করিয়া তিনি এদেশে নবজাগরণ আনিয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

আমরা আজ যে ভারতবর্ষে বাস করিতেছি, তাহা বিংশ

শতাব্দীর ভারতবর্ষ। আজিকার এই 'নব ভারতে' বসিয়া আমরা কল্পনাও করিতে পারি না যে, একশত বৎসর আগে এই দেশের অবস্থা কী ছিল। বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রার দিনে—উড়োজাহাজ আর কলের কামানের যুগে; মিল ও ফ্যাক্টরী, বিদ্যুৎ ও রসায়নের অগ্রগতির যুগে;—অন্ধকার ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন একশত বৎসর আগেকার ভারতবর্ষের রূপ সম্বন্ধে ধারণা করাও এখন দুঃসাধ্য। তবে ইতিহাস পড়িলে সে যুগের ছবি আমাদের চোখের সামনে খানিকটা ভাসিয়া উঠে।

রাজা রামমোহন রায় ভারতবর্ষের সেই 'অন্ধযুগে' ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলায় আরামবাগ মহকুমার অধীন রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামকান্ত রায়।

পলাশীর যুদ্ধের পর দেশে সবেমাত্র ইংরেজ-শাসন স্থাপিত হইয়াছে। নবাবী আমলের আদব-কায়দা তখনও দেশে প্রচলিত। শাসন-ব্যবস্থা এখনকার মত সুশৃঙ্খল তো হয়-ই নাই, বরং দেশে অবিচার অত্যাচার সর্ব্বক্ষণ লাগিয়াই ছিল। তাহার উপর আবার সমাজে এমন সমস্ত রীতিনীতি ও চালচলন প্রচলিত ছিল যে, কোন লোকের পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করা তো দূরের কথা, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা এবং কথা বলাও সম্ভব ছিল না। কাজেই দেশের অবস্থা তখন যে কিরূপ শোচনীয় ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

প্রত্যেক দেশের অধঃপতন ঠিক এমনি করিয়াই আসে। লোকের স্বাধীন চিন্তাশক্তি যখন লোপ পায়, স্পষ্টভাবে অধিকার

দাবী করিবার ক্ষমতা যখন আর থাকে না, তখন মানুষকে জড়পিণ্ড ব্যতীত আর কিছুই বলা চলে না। তাহার জীবন তুনিয়ার কোন কাজেই লাগে না—"ন দেবায়, ন ধর্ম্মায়"। লোহাকে আগুনে তাতাইয়া যেমন বিবিধ কার্য্যোপযোগী অস্ত্র তৈয়ারী হয়, মানুষকেও সেইরূপ শিক্ষিত করিয়া মহত্তর আদর্শানুসরণে ও কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান যায়। ভারতীয় জীবন তখন ঠিক লৌহের ন্যায় জড় পদার্থই ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামমোহন যখন বাঙ্গলার অখ্যাত অজ্ঞাত এক পল্লীগ্রামে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করেন, তখন বাঙ্গলায় তথা ভারতে চিন্তার এই তুর্ভিক্ষ সর্ব্বত্র বিরাজমান ছিল; এই ক্ষয়রোগ সমাজদেহের মজ্জায় মজ্জায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই দেশের অবস্থা যে অত্যন্ত অধঃপতিত ছিল,—মূঢ়তা ও জড়তায় দেশ যে ছাইয়া গিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি!

কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলাদেশে—অবাধ চিন্তা ও কর্ম্মোদ্যমের যুগে—জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাধনার ক্ষেত্রে—আমরা বর্ত্তমান ভারতবর্ষের স্রষ্টাকে মাঝে মাঝে ভুলিয়া যাই;—ভুলিয়া যাই সেই বিরাট প্রতিভাবান পুরুষকে—যিনি বিগত শতাব্দীর মুমূর্ষু পাণ্ডুর ভারতবর্ষে প্রথমে প্রাণসঞ্চার করিয়াছিলেন।

কি করিয়া সেই ঘুমন্ত ভারতের নবজাগরণের সূচনা হইল, তাহা আমাদের জাতীয় জীবনের এক গৌরবময় ইতিহাস। রাজা

রামমোহনের সমগ্র জীবন সেই নবজাগরণের ইতিহাসের প্রায় সমস্ত রসদই যোগাইয়াছে। কাজেই রামমোহনের জীবনী অষ্টাদশ শতকের শেষাংশে এবং উনবিংশ শতকের প্রথম এক-তৃতীয়াংশে বাঙ্গলার তথা ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। সেইজন্যই রামমোহন নবীন ভারতের স্রষ্টা (maker of modern India)। বাস্তবিক পক্ষে বর্ত্তমান ভারতে যে সকল জনহিতকর কর্ম্মপ্রচেষ্টা চলিতেছে, রাজা রামমোহনই হয় তাহা আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন, নয়, তিনি সে বিষয়ে দেশবাসীকে নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন ; সুতরাং আমরা যদি বলি,—আমরা ভারতে বিজ্ঞানের রাজ্যে বাস করিতেছি বটে, কিন্তু আজও আমরা রামমোহনের যুগেই আছি, তাহাতে কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি হয় না। কেন হয় না, তাঁহার কর্ম্ম ও চিন্তাপ্রণালী আলোচনা করিলেই আমরা তাহার সন্ধান পাইব।

'রাজা'র জন্মের সময় যে তৎকালীন ভারত কুসংস্কার, অজ্ঞতা এবং মূঢ়তায় আচ্ছন্ন ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যৌবনের প্রারম্ভ হইতে তিনি কেবল ইহার বিরুদ্ধে দশজনের মত মৌখিক প্রতিবাদ জানাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, স্বীয় বিশ্বাসকে আপন জীবনে কার্য্যকরী করিতে গিয়া তিনি পদে পদে বিপদ বরণ করিয়াছেন, অর্থকষ্ট ভোগ করিয়াছেন, সমাজচ্যুত হইয়াছেন, এমন কি জীবনকে সঙ্কটাপন্ন পর্য্যন্ত করিয়াছেন। আজন্ম সুখে পালিত রামমোহন অভ্যস্ত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে শিখিলে হয়ত সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনটা কাটাইয়া দিতে

পারিতেন, কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্য সাধন যাঁহার জীবনব্রত তিনি কেন সাধারণের ন্যায় সুখদুঃখে মুগ্ধ বা বিচলিত হইয়া পড়িবেন? তিনি জয় করিবার প্রতিভা লইয়াই জন্মিয়াছিলেন, কাজেই চিরাচরিত অর্থহীন সংস্কারে তাঁহার মন কখনও সায় দিতে পারে নাই। বরং নব নব কর্ম্মপ্রেরণায় সমস্ত দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তিনি ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের মহিমময় সম্ভাবনার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

সাধারণতঃ দেখা যায়, প্রতিভাবান ব্যক্তিমাত্রই একটু চঞ্চল প্রকৃতির হইয়া থাকেন। রামমোহনও শৈশবে অতি চঞ্চল ছিলেন। তখনকার দিনে আরবী ও ফারসী না শিখিলে (যেমন আজকাল ইংরাজী) কোন শিক্ষাই পূর্ণাঙ্গ হইত না। নয় বৎসর বয়সে রামমোহনও আরবী ও ফারসী শিখিবার জন্য পাটনায় গেলেন। সামান্য কয়েক বৎসরে তিনি ইসলামী শাস্ত্রে এত বড় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন যে, শাস্ত্রজ্ঞ মুসলমানগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে 'জবরদস্ত মৌলবী' নাম দিয়াছিলেন।

রামমোহন ছিলেন স্বাধীনতা-মন্ত্রের জীবন্ত বিগ্রহ। কি চিন্তাক্ষেত্রে, কি ধর্ম্মরাজ্যে, কি সমাজসংস্কারে, কি স্বাধীনতা আন্দোলনে, কি বিশ্বপ্রেমে, তিনি ছিলেন সকলের অগ্রদূত। বাল্যেই তাঁহার স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম্মের স্ফুরণ হয় এবং তাহা অনুসরণ করিতে গিয়া দুঃখভোগ করিবার শক্তিও তিনি লাভ করেন। অতি অল্পবয়সে যখন বাঙ্গালীর ছেলে ঠাকুরমা-দিদিমার বস্ত্রাঞ্চলে আচ্ছাদিত থাকে, ননী-মাখনও মুখে রোচে

না, সামান্য কথা বা ব্যথায় কান্নাকাটি করিয়া পাড়া মাথায় করিয়া তোলে, সেই সুকুমার বয়সেই রামমোহন সত্যানুসন্ধিৎসায় পাগলের মত হইয়া স্বাধীন মত প্রতিষ্ঠার জন্য দুর্লজ্ঘ্য হিমাচল পার হইয়া সুদূর তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য ছুটিয়া গিয়াছিলেন। পাটনা হইতে ফিরিয়া আসিয়া হিন্দুধর্ম্মের গোঁড়ামি ও মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে তিনি প্রবল যুক্তিতর্ক উপস্থিত করিলেন। আত্মীয়স্বজন বিরক্ত হইল; সহ্য করিতে না পারিয়া স্নেহপ্রবণ পিতাও তাঁহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিলেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সত্যানুসন্ধিৎসু রামমোহন তিব্বতের দুরধিগম্য হিমশীতল প্রদেশে সহস্র সহস্র মাইল পদব্রজে চার বৎসর ঘুরিয়া বেড়াইলেন।

শুধু তাহাই নয়। যে হিন্দুধর্ম্মের প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম অনুসন্ধানের জন্য সে কী কঠোর শ্রম! বারাণসীতে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বজনীনতা ও একেশ্বরবাদিতা প্রমাণিত করেন। আবার খৃষ্টধর্ম্মের মূলতত্ত্ব বুঝিবার জন্য তিনি মূল বাইবেলগ্রন্থ হিব্রু ও ল্যাটিন ভাষায় অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিলেন। খৃষ্টীয় মিশনারীরা যখন হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন, তখন কোনও হিন্দু নেতাই যাহা পারেন নাই, রামমোহন তাহাই সাধন করিলেন,—নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় প্রমাণে ও যুক্তিবাণে প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বজনীনতাও

প্রমাণিত করিলেন। তাই বলিয়া, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত সত্যকে তিনি কখনও অস্বীকার করেন নাই। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য অনেকে তাঁহাকে "অদীক্ষিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক" বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

বস্তুতঃ সত্যানুসন্ধিৎসাই রামমোহনের ধর্ম্মজীবনের মূলমন্ত্র ; উহাতেই তাঁহার প্রতিভার চরম বিকাশ। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান, এই তিন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের সার সংগ্রহ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, প্রত্যেক ধর্ম্মের ঈশ্বর এক ও অভিন্ন এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ধর্ম্মে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নাই ; এখানে পরব্রহ্মের উপাসনাই জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য এবং মুক্তিলাভের উপায়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে রামমোহনের উদারতা এবং পরধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের সকলেরই অনুকরণযোগ্য।

কেবলমাত্র ধর্ম্ম সম্বন্ধেই রামমোহন স্বাধীন মতের প্রতিষ্ঠা করেন নাই। সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার প্রতিভা নিয়োজিত হইয়াছিল। সত্যানুভূতি তাঁহাকে দেশের দুর্দ্দশায় পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি জানিতেন,—হিন্দুর পতনের মূল কারণ কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও মূঢ়তা। তাই তিনি সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন। একবার তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত বলিয়াছিলেন,—"আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে, হিন্দুদের আচরিত ধর্ম্ম তাহাদের রাজনৈতিক উন্নতির পথে কণ্টকস্বরূপ। আমার মনে হয়, এই ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন

বাঞ্ছনীয়। অন্ততঃ রাজনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক শান্তির জন্য ইহা আবশ্যক।” বর্ত্তমান ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এই উক্তির যাথার্থ্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিবেন।

কেবলমাত্র পথনির্দ্দেশ করিয়াই রামমোহন ক্ষান্ত হন নাই; সকল বাধা অগ্রাহ্য করিয়া নূতন পথে অগ্রসর হইবার সাহস তাঁহার ছিল। কি: সতীদাহ-প্রথা সম্বন্ধে, কি হিন্দুনারীর সম্পত্তিতে অধিকার ব্যাপারে, কি বাল্যবিবাহ নিরোধ বিষয়ে, কি কন্যাপণ নিবারণে, কি জাতিভেদ প্রথার কুফল দূরীকরণে—এইরূপ বহু ব্যাপারেই তিনি আজীবন আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন।

রামমোহন জানিতেন যে, ধর্ম্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের সাফল্য অনেকাংশে সুশিক্ষা বিস্তারের উপর নির্ভর করে। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভারতের উন্নতি প্রাচীনকে আঁকড়াইয়া থাকিলেই আসিবে না; ভারতের উন্নতি নির্ভর করে যুগোপযোগী শিক্ষা ও সাধনার উপর। মানুষের মন যদি উদার হয়, সুশিক্ষা যদি সে পায়, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা যদি তাহার জন্মে, তবে কুসংস্কার ও মূঢ়তা তাহার উন্নতিতে বাধা দিতে পারে না, তাহার উন্নয়ন অনিবার্য্য। সেইজন্য যখন প্রাচ্যশিক্ষা বনাম পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা লইয়া বিষম বিরোধের সৃষ্টি হইল, তখন রামমোহন পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদান-প্রথাকে সমর্থন করিলেন। লর্ড আমহার্ষ্ট সংস্কৃত শিক্ষার

আয়োজন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"গভর্ণমেণ্ট যদি এই দেশবাসীর যথার্থ কল্যাণসাধনে অভিলাষী হইয়া থাকেন তাহা হইলে যেরূপ উদার ও উন্নত শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরবিদ্যা এবং অনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে সেরূপ শিক্ষা প্রবর্ত্তন করুন।" এক কথায় বলা চলে, তাঁহার প্রাণপাত আন্দোলনের ফলেই আজ দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চায় প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ সম্ভব হইয়াছে। যদি তখন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ না করিত, তবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চায় পৃথিবীর মধ্যে ভারত যে সামান্য প্রতিষ্ঠাও অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে, তাহাও এতদিনে সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি স্বদেশের প্রাচীন বিদ্যাকেও অবহেলা করেন নাই।

ভারতবর্ষের উন্নতির পথে প্রধান কণ্টক রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা। কিশোর বয়সেই রামমোহন তাহা তীব্রভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। কথিত আছে, মুখ্যতঃ ইংরেজ-শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াই তিনি তিব্বত যাত্রা করেন; পরে অবশ্য তাঁহার মতামত কিছু পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু আমৃত্যু তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভই ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হওয়া উচিত। যখনই তিনি সুযোগ পাইয়াছেন, কি এদেশে, কি বিলাতে, ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী সর্ব্বত্রই প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

সকলেই জানেন, মত প্রকাশের স্বাধীনতাই রাষ্ট্রীয়

স্বাধীনতার মূলভিত্তি। কিন্তু ইংরেজ শাসনের প্রথমভাগেই ১৮২৩ সালে মুদ্রাযন্ত্র কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। তখন রামমোহন উহার প্রতিবাদে তাঁহার সম্পাদিত কাগজ 'মিরাট-আল্-আকবরের' প্রকাশ স্বেচ্ছায় বন্ধ করিয়া দেন। তিনি পার্লামেণ্টে পর্য্যন্ত ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয় নাই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিবাদ করিয়া একদা তিনি বলিয়াছিলেন—"চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেশের ভূস্বামীদের সম্পদ বাড়াইয়াছে, কিন্তু ইহা দ্বারা দরিদ্র কৃষকের কোনও উন্নতি হয় নাই।" একশত বৎসর পূর্ব্বেই যিনি দেশের অবস্থা মানসনেত্রে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তিনি তো ঋষি ছাড়া আর কিছুই নহেন! সেইজন্যই তিনি নব্যভারতের গুরু।

নিজ দেশের পরাধীনতার জন্য তিনি যত বেদনা পাইতেন, পৃথিবীর যে কোনও পরপদানত দেশের সম্বন্ধেই সেইরূপ ব্যথা অনুভব করিতেন। নেপল্স্বাসীরা স্বাধীনতাযুদ্ধে পরাজিত হইলে তিনি অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। আবার স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইলে আনন্দের আতিশয্যে কলিকাতা টাউন হলে তিনি এক বিরাট ভোজ দিয়াছিলেন। বিলাত যাত্রার সময় ফরাসী সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া নিজের শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও আগ্রহের সহিত তিনি এই বলিয়া অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন, "Glory, Glory to France."

Reform Bill আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"ইহাকে কেবল সংস্কারকামী ও প্রাচীনপন্থীদের সংগ্রাম বলিলে চলিবে না। ইহা স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সমগ্র পৃথিবীর স্বাধীনতার সংগ্রাম। ইহা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, অধর্ম্মের বিরুদ্ধে ধর্ম্মের সংগ্রাম।"

এই প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষ চিরজীবন যুদ্ধ করিয়াই গিয়াছেন—সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সর্ব্বত্রই নির্ভীকভাবে জীবন বিপন্ন করিয়াও একাকী সংগ্রাম করিয়াছেন। বিলাতে গিয়াও সে প্রচেষ্টার বিরাম ছিল না। সেইজন্য অতিরিক্ত মানসিক শ্রম ও প্রতিকূল আবহাওয়ায় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ব্রিস্টল সহরে জ্বরাক্রান্ত হইয়া এই লোকোত্তর প্রতিভাশালী নরকেশরীর দেহাবসান ঘটে।

রাজা রামমোহনের নশ্বর দেহের মৃত্যু হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার আত্মা সমস্ত প্রগতিশীল ভারতবাসীর মধ্যে ছড়াইয়া আছে। সেইজন্যই তিনি অমর—তাঁহার নশ্বর দেহাবসান পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সেতুবন্ধ রচনা করিয়াছে, মৃত্যুভীত ভারতীয়দের জীবনে অবিরাম জাগরণের বন্দনাবাণী শুনাইতেছে। বলিতেছে,—

"আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।"

২



কর্ম্মবীর সন্ন্যাসী

হাইকোর্টের একজন নামজাদা উকিলের বাড়ী। তাই বাড়ীতে সর্ব্বক্ষণ নানাজাতির লোক মামলা-মোকর্দ্দমা উপলক্ষ্যে ভিড় করিয়া থাকে। হিন্দু-মুসলমান,—সকল জাতির মক্কেলই বৈঠকখানায় প্রতিদিন আসা যাওয়া করেন।

একদিন এক অহিন্দু মক্কেল আদর করিয়া উকিলের

ছেলেকে কয়েকটি সন্দেশ দিয়া গেলেন। মক্কেলটি চলিয়া যাওয়ার পর ছেলেটি সেই সন্দেশ খাইল। কিন্তু ব্যাপারটা যখন বাড়ীতে জানাজানি হইয়া গেল যে, ঐ বালক এক অহিন্দুর দেওয়া সন্দেশ খাইয়াছে, তখন বাড়ীময় একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। ছেলেটির উপর চারিদিক হইতে গালিগালাজ বর্ষিত হইতে লাগিল। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল, 'ছেলেটির জাত গিয়াছে!' বাড়ীর লোকেরা ছিলেন এমনি গোঁড়া!

বালক আশ্চর্য্য হইল; তাহার মনে দুঃখ হইল এই ভাবিয়া যে, সমাজে এই রকম বৈষম্য কেন? কেন আমরা বিশেষ বিশেষ জাতির স্পর্শ এড়াইয়া চলি? অন্য জাতির বলিয়া মক্কেলটির স্নেহের দান, আদরের দান গ্রহণ করায় কি এমন অন্যায় আমার হইয়াছে? শুধু তাহার হাতের ছোঁয়া খাবার খাইয়া আমার জাত যাইবে কেন?—এমনিতর বহু প্রশ্ন বালকটির মনে জাগিতে লাগিল।

যাহা হউক, সেদিন সে শুনিল যে, সমাজে এমন অনেক জাত ও শ্রেণী আছে যাহাদের ছোয়া খাইলে জাত যায়। কথাটায় তাহার মন সায় দিল না বটে, কিন্তু জাতিভেদ আর অস্পৃশ্যতা বলিয়া একটা কুপ্রথা যে হিন্দুসমাজে আছে, তাহা সে উপলব্ধি করিল।

ইহার পর আর একদিন আবার এমন একটা ঘটনা এই বালকটির জীবনে ঘটিয়া গেল যাহা হইতে এই বালকের ভাবী জীবনের কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গিয়াছিল।

যেদিন হইতে সে শুনিয়াছিল যে, সমাজের কোন কোন জাতির ছোওয়া লাগিলে অথবা ছোওয়া খাইলে জাত যায়, সেইদিন হইতে এই ছেলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—'দেখিব, এই জাতিভেদ কতখানি সত্য!'

এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরের কথা। একদিন বালক তাহার পিতার বৈঠকখানায় ঢুকিয়া একটা হুকা লইয়া প্রাণপণে টানিতেছিল। হুকাটা সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল।

হঠাৎ পিছন হইতে পিতা ভারী গলায় ডাকিলেন—"কি রে বিলে! কি করিতেছিস্?"

বালক উত্তর দিল, "যদি জাতিভেদ না মানি তবে আমার কি হইবে, তাহাই পরীক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু কৈ এই হুঁকা খাইয়া আমার জাত তো গেল না।"

পুত্রের এই আচরণে পিতা বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন যে, এত অল্প বয়সে বালকের মধ্যে এরূপ বিচারবুদ্ধি জন্মিল কি করিয়া?

জাতিভেদ আর অস্পৃশ্যতা প্রথা যে অর্থহীন একথা এই বালক তাহার কিশোর বয়সেই বুঝিয়াছিল। তাই পরিণত বয়সে ইনি মুচি, মেথর, ডোম প্রভৃতি সমাজের তথাকথিত অস্পৃশ্যদের আত্মার আত্মীয় বলিয়া ঘোষণা করিতে কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।

এই বালকের নাম নরেন্দ্রনাথ। কলিকাতার সিমুলিয়ার

বিখ্যাত দত্তবংশে ইহার জন্ম। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ইনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

জাতিভেদ আর অস্পৃশ্যতার পাপের মূলে যে সকল মনীষী কুঠারাঘাত করিয়া গিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। সমাজে জাতিভেদ আর অস্পৃশ্যতা প্রথা অনুসৃত হইয়া আসিতেছিল বলিয়াই যে উহাকে একটি মঙ্গলকর প্রথা বলিয়া মানিয়া লওয়া প্রয়োজন—এ কথায় স্বামী বিবেকানন্দের মন সায় দেয় নাই। শাস্ত্রের বিধান, প্রচলিত সামাজিক প্রথা ইত্যাদি তিনি অন্ধভাবে অনুসরণ করেন নাই। সে সকলের সত্যতা কিশোর বয়স হইতেই যাচাই করিবার জন্য আগ্রহ তাঁহার জন্মিয়াছিল এবং যে পর্য্যন্ত তাঁহার সন্দেহ দূর না হইত, সে পর্য্যন্ত বিশ্রাম থাকিত না। ছেলেবেলা হইতে নরেন্দ্রনাথের মধ্যে এমনি একটা বিচারশক্তি, এমনি একটা একগুঁয়ে ভাব ছিল বলিয়াই তিনি পরবর্ত্তী কালে অত মহান্ হইতে পারিয়াছিলেন।

ছেলেবেলা হইতেই নরেন্দ্রের কাজে প্রকাশ পাইত একটা দুর্জ্জয় সাহস এবং বলিষ্ঠ কল্পনা।

তখন তাঁহার বয়স আট। সখ হইল নৌকা করিয়া বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখিতে হইবে। সুতরাং কয়েকজন বন্ধু লইয়া নৌকায় চড়িয়া তিনি মহানন্দে 'গার্ডেন' দেখিতে গেলেন। ফিরিবার সময় বাধিল ভীষণ গোলমাল। নৌকায় কে কি

করিয়াছিল,— তাহা লইয়া মাঝিদের সঙ্গে প্রথমে কথা কাটাকাটি, পরে মাঝিদের রাগ সপ্তমে চড়িল। মাঝিরা বলিল যে, তাহারা নৌকা ডাঙ্গায় ভিড়াইবে না, ছেলেদেরকে জব্দ করিবে। ছেলেরা তো হতভম্ব! কিন্তু যেই নৌকা তীরের খানিক নিকটে যাওয়া, আর অমনি নরেন্দ্রনাথ ডাঙ্গায় লাফাইয়া পড়িয়া ছুটিলেন। কিছুদূর দিয়া দুইজন গোরা সৈন্য যাইতেছিল। নরেন্দ্রনাথ সোজা তাহাদের কাছে গিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে নিজেদের বিপদের কথা জানাইলেন। এইটুকু ছেলের এমন সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধি দেখিয়া তাহারা অবাক হইল। বালক নরেন্দ্র তাহাদের রাস্তা দেখাইয়া ঘটনাস্থলে আনিলেন। তাহারা বালকদের এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিল।

ছেলেবেলা হইতেই নরেন্দ্রের সাহসিকতা, সত্যনিষ্ঠা ও নেতৃত্ব এই রকম শতসহস্র ঘটনার মধ্যে আপনা আপনিই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই স্বভাবজাত বৃত্তির সাহায্যেই নরেন্দ্রনাথ পরে বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দরূপে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান যুগে যে সব বাঙ্গালী নিজেদের জীবনের সাধনা দিয়া ভারতবর্ষকে জগতের সম্মুখে মর্য্যাদা দান করিয়াছেন, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন,—তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের কথা।

বিগত শতাব্দীর শেষভাগে ও বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে এই বীরসিংহের প্রচণ্ড বিক্রমে, বাগ্মিতায় ও জ্ঞানগরিমায়,

স্বদেশভক্তি ও বিশ্বপ্রেমে সমগ্র পৃথিবী শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াইয়াছিল। সামান্যমাত্র গৈরিক বসনে পৃথিবী জয় করিয়া আসা—একমাত্র এই অসীম প্রতিভাশালী হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল।

পৃথিবীর ইতিহাস খুঁজিলেই চোখে পড়ে এমন কতকগুলি লোকের কথা, যাঁহারা পৃথিবীর চেহারা বদলাইয়া দিয়াছেন,—যাঁহাদের স্বভাব, কাজ, চলাফেরা প্রভৃতি সাধারণ লোক হইতে যেন একটু আলাদা। আমাদের মতই তাঁহারা হাসেন, খান, ঘুমান। কিন্তু আমরা যে জিনিষটা সাধারণভাবে দেখি, সেই জিনিষটা হইতেই হয়ত তাঁহারা এমন কোন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন, যাহা তাঁহাদের নিজেদের সমগ্র জীবনধারা বদলাইয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর রূপ পরিবর্ত্তনেও সহায়তা করে।

কিন্তু সেই জিনিষটা কি, যাহার এত ক্ষমতা, যাহা মানবসমাজে একটা ওলটপালট আনিয়া দেয়, যাহা প্রচলিত বাধা-নিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তুনিয়াতে নূতন সমাজের পত্তন করে? কোন মহান্ আদর্শের অনুপ্রেরণা শক্তিশালী মহামানবের চিত্তে সঞ্চারিত না হইলে এরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয় না। দৃঢ়সঙ্কল্প বিশ্বজয়ের আকাঙ্ক্ষার সহিত সম্মিলিত হইয়া নেপোলিয়নকে দিগ্বিজয়ী করিয়াছিল; কপিলাবস্তুর শুদ্ধোদনের পুত্রকে কে চিনিত, যদি তিনি মানবের তুঃখ দূর করিবার জন্য রাজ্য-সংসার পরিত্যাগ করিয়া তুঃখজয়ের সাধনায় আত্মনিয়োগ

না করিতেন ? সেইজন্যই একটা প্রবাদ আছে,—বোমা-বারুদের চেয়ে অনেক বেশী বিস্ফোরণের ক্ষমতা রহিয়াছে এক একটি ভাবধারার মধ্যে ! নহিলে, একজন সামান্য বাঙ্গালীর ছেলে মাত্র তেত্রিশ বৎসর বয়সে ১৮৯৬ সালে চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভায় দাঁড়াইয়া সমবেত পাশ্চাত্ত্য ধর্ম্মের খ্যাতনামা প্রতিনিধিগণের সম্মুখে কেমন করিয়া নিজের বাগ্মিতায় সমস্ত পৃথিবীর মনকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছিলেন ? সেদিন যদি বিবেকানন্দ ব্যর্থ হইতেন—বিপদে ও সঙ্কোচে নুইয়া পড়িতেন, তবে আজ পাশ্চাত্ত্য জগতের কাছে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসভ্যতা এতখানি মর্য্যাদা পাইত না। স্বামী বিবেকানন্দই সর্ব্বপ্রথম জগৎকে শিখাইয়াছিলেন ভারতকে শ্রদ্ধা করিতে, ভারতের মহিমা, মর্য্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে।

বাল্যকাল হইতেই বিবেকানন্দ দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশায় অস্থির হইয়া পড়িতেন ; তাঁহার মনে ধর্ম্মভাবও অত্যন্ত প্রবল ছিল। পরবর্ত্তী কালে এই ধর্ম্মভাবের সহিত তাঁহার স্বদেশানুরাগ মিশিয়া গিয়া তাঁহার অন্তরে এক নবভাবের বিকাশ ঘটাইয়াছিল। এই নবভাবই হইল তাঁহার দরিদ্র-নারায়ণের সেবাব্রত।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, বিবেকানন্দ ছিলেন হিন্দুসন্ন্যাসী, যিনি বর্ত্তমান যুগের হিন্দুধর্ম্মকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন। আবার কেহ তাঁহাকে দার্শনিক পণ্ডিতরূপে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবেন। অনেকে তাঁহাকে একজন বিশ্বপ্রেমিক হিসাবেই গণ্য করিতে পারেন। কিন্তু আমরা বলিব,—তিনি ছিলেন

নবীন ভারতের জাগরণমন্ত্রের ঋষি। বর্ত্তমান ভারতে যে গণজাগরণ দেখা যাইতেছে, তাহার মূলে তাঁহার বাণী নিঃশব্দে প্রাণসঞ্চার করিতেছে।

সকলেই মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আন্দোলনের কথা জানেন। কিন্তু কয়জন একথা জানেন যে, প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এই বীর সন্ন্যাসীই ভারতের পদদলিত মূক মানব-সন্তানকে ডাকিয়া আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন ; বলিয়াছিলেন,—"তোমরা সকলে অমৃতের সন্তান, তোমরা দরিদ্র-নারায়ণ।" বিবেকানন্দই প্রথমে তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে দরিদ্রের প্রতি নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

১৮৮৬ সালে গুরু পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর বিবেকানন্দ সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেন। কোথাও তিনি শান্তি দেখিতে পাইলেন না। শুধু দেখিতে পাইলেন, মানুষের দুঃখ, দারিদ্র্য, শোক আর সন্তাপ। তাঁহার হৃদয় সমবেদনায় উথলিয়া উঠিল। একদিন ভারতের শেষপ্রান্তে সমুদ্রতীরে কন্যাকুমারিকায় বিবেকানন্দ নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন—অকস্মাৎ তাঁহার চোখের সামনে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ভারত প্রকাশিত হইল,—"এই আমার ভারতবর্ষ, এই আমার মাতৃভূমি,—দুর্ভিক্ষ-মহামারী-দুঃখ-রোগ-শোক-ব্যথা-জর্জ্জরিত, ছিন্নবসন-পরিহিত, যুগ-যুগান্তের নিরাশা-ক্লিষ্ট নর-নারী, বালক-বালিকাগণ

অন্নাভাবে প্রপীড়িত, আশা-উদ্যম-আনন্দ-উৎসাহের অভাবে ভারত কঙ্কালে পরিপ্লুত, মহাশ্মশানে পরিণত!" বিবেকানন্দের চোখ দিয়া ঝর ঝর অশ্রুধারা বহিল। মনে হইল, "এদের ফেলিয়া আমি কোথায় ঈশ্বর খুঁজি? এরাই তো জীবন্ত ঈশ্বর।" গৌতম বুদ্ধের মত উপেক্ষিত মানুষের মুক্তির জন্য বিবেকানন্দ স্বদেশের কল্যাণ-কামনায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

পৃথিবীর যেখানেই তিনি গিয়াছেন, অন্য জাতির অবস্থার সহিত ভারতবাসীর অবস্থা তুলনা করিয়া তাঁহার প্রাণ সকল সময়েই ছট্‌ফট্ করিত। শয়নে-জাগরণে তাঁহার শুধু এক স্বপ্ন ছিল,—কি করিয়া এই অধঃপতিত জাতিকে উন্নত করা যায়, সকল জাতির সমান মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়। জাপানীদের উন্নতি দেখিয়া কোন বন্ধুকে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত থেকে বাইরে এসে দেখ, সব জাতি কেমন চলেছে! তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? তা' হলে এসো, ভাল হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। পেছনে যেও না, সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অন্ততঃ এরূপ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, জন্তু নয়।"

বিজয়ীর বেশে দেশে দেশে ফিরিয়া বিবেকানন্দ আমাদের অধঃপাতের কারণ নির্ণয় করিলেন। ইহাদের মধ্যে শারীরিক অক্ষমতা প্রধান। শরীর দুর্ব্বল হইলে মস্তিষ্কও দুর্ব্বল হয়; সকল কাজে অবসাদ আসে ও প্রতি পদে নিজের অপদার্থতা পরিস্ফুট হয়। কাজেই তিনি দেশের যুবকদিগকে শারীরিক শক্তি

অৰ্জ্জনে ও ব্রহ্মচর্য্য পালনে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কার-ব্রতে তিনি সকলকেই উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। যুবকদের ডাকিয়া বলিলেন,—"দুর্ভিক্ষ হয়েছে, চলে যা সেই দিকে, না হয় মরেই যাবি। তোর আমার মত কত কীট হচ্ছে, মরছে; তা'তে জগতের কি আস্‌ছে যাচ্ছে? একটা মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো যাবিই! তা ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে মরাই ভাল। তোরাই তো দেশের আশা-ভরসা। তোদের কর্ম্মহীন দেখলে বড় কষ্ট হয়। লেগে যা!—দেরী করিস্ না—মৃত্যু তো দিন দিন নিকটে আস্‌ছে। পরে করবি বলে আর বসে থাকিস্‌নি, তা' হলে কিছুই হবে না!"

এই স্বদেশভক্ত বীর-সন্ন্যাসীর প্রতি রক্তকণায় স্বদেশের প্রতি গভীর মমতার স্রোত প্রবাহিত হইত। একদিন কোন দেশনেতার সহিত আলাপে তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"যে পর্য্যন্ত আমার জন্মভূমির একটি কুকুর অভুক্ত থাকিবে ততদিন তাহাকে আহার প্রদানই আমার ধর্ম্ম। ইহা ছাড়া আর যা' কিছু সব অধর্ম্ম!"

বিবেকানন্দ রাজনীতিক ছিলেন না, তাঁহার লক্ষ্য ছিল সাধারণ রাজনীতির অনেক উর্দ্ধে, দেশকেও তিনি সেই উচ্চতর লক্ষ্যে, উচ্চতর আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে প্রাণপণ প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ রাজনীতিতে যোগ দেন নাই। কিন্তু ইহা সকলেই জানেন, তিনি যে সেবাধর্ম্ম জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন, তাহাই

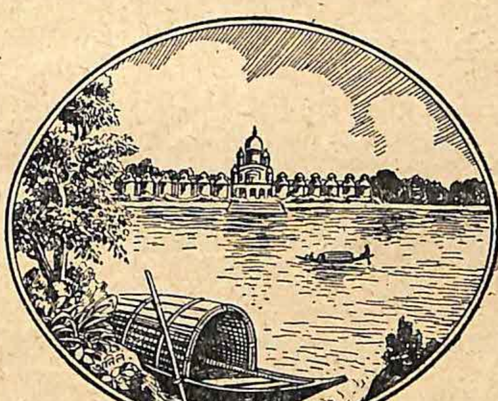
বর্ত্তমান ভারতের গণ-জাগরণরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সেইজন্য স্বামীজী এমন একদল নরনারী তৈয়ারী করিতে চাহিয়াছিলেন, "যাহারা গতানুগতিক ভাবে স্বার্থান্ধ হইয়া ভোগ-লালসার পশ্চাতে ধাবিত হইবে না—যাহারা নরনারায়ণের সেবায় সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া যুগ-পরিবর্ত্তনের সহায়ক হইবে, অবশিষ্ট জীবন মাতৃভূমির উন্নতিকল্পে ব্যয় করিবে,—অথবা এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে।"

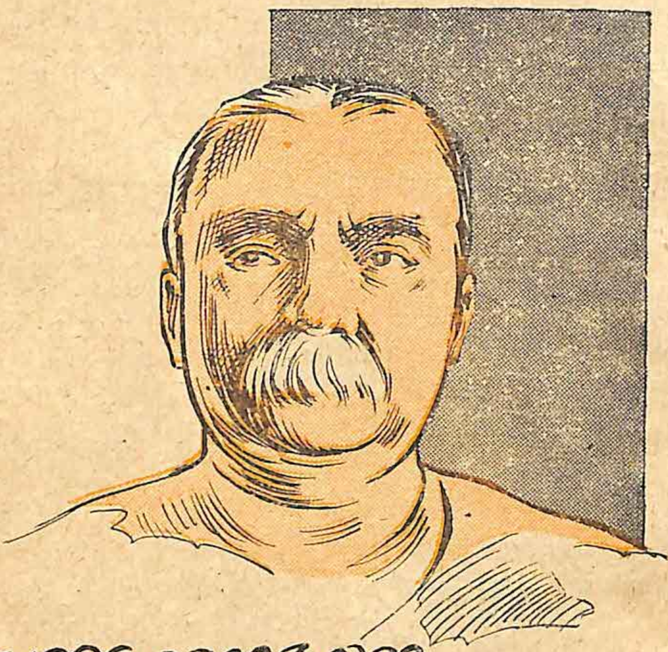
ইহাই হইল বিবেকানন্দের নবযুগের সন্ন্যাসধর্ম্ম। ইহাকে আশ্রয় করিয়া কত লোক পরহিতের জন্য ঘর ছাড়িয়াছেন, কত লোক অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, আবার কতজন আদর্শের জন্য জীবনপাত করিয়াছেন। বিশ্বকল্যাণব্রতী সন্ন্যাসীর নিকট সকল পতিত মানবে ঈশ্বরের সত্তা অনুভূত। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিলেন, ভারতের অধঃপতনের মূলে অসাম্য—বিশেষ করিয়া সামাজিক অসাম্য। তাই তিনি জাতিকে বাঁচাইবার সঞ্জীবনী মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—"আমার দিব্যচক্ষে দেখ্‌ছি এদের ও আমার ভিতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য। সর্ব্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হ'লে কোন দেশ কোনকালে উঠেছে দেখেছিস্?"

এই অধঃপতনেও সন্ন্যাসী বিচলিত হন নাই। সকলকে আশার বাণী শুনাইয়া তিনি বলিলেন,—"এবার কেন্দ্র—ভারতবর্ষ। কিন্তু কি করিয়া মৃত্যুর হাত হইতে ভারতকে রক্ষা করা সম্ভব? প্রত্যেক মানুষকে মানুষের মর্য্যাদা না দিলে তো কোন দেশ

বাঁচিতে পারে না।" তাই তিনি ভারতবাসীকে জলদগম্ভীর স্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে মানব, মৃত্যুর পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজায় আহ্বান করিতেছি।... দুর্ব্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষ্যা-দ্বেষ ও ভেদাভেদ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র পরিবর্ত্তনে সহায়তা কর।"

এই যুগসন্ধিক্ষণে বিবেকানন্দের উদাত্ত আহ্বান কি ব্যর্থ হইবে?





স্যার আশুতোষ

শিক্ষাব্রতী পুরুষসিংহ

একদিন সহসা কলিকাতা সহরে একটা দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটিয়া গেল, আর সংবাদটা অল্পসময়ের মধ্যেই মুখে মুখে চারিদিকে রটিয়া গেল। কেহ কোনদিন যাহা ভাবিতে পারে নাই, তাহাই সম্ভব হইল। জুড়ী গাড়ী হাঁকাইয়া একদিন এক ব্যক্তি খাঁটি বাঙ্গালীর পোষাক পরিহিত হইয়া ময়দানের নিকটস্থ 'রেড রোডে'র ফটকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গোরা

পাহারাওয়ালা বাধা দিল। বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহার রোষ-নেত্র তুলিয়া বলিলেন, "জানিস্, আমি কে? স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জি, কলিকাতা হাইকোর্টের জজ।" পাহারাওয়ালা সেই রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে ভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল। আশুতোষ কিন্তু সেইখানেই নিরস্ত হইলেন না। তিনি বাড়ী ফিরিয়াই সোজা বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেলকে ফোন করিলেন,—"আমি স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জি, কলিকাতা হাইকোর্টের জজ, আপনাকে একটা বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি,—কলিকাতার 'রেড রোডে'র উপর দিয়া এ দেশের লোকদের চলাচল নিষিদ্ধ কি?" গভর্ণর উত্তর দিলেন—You may go. You শব্দের অর্থ এখানে তুমি না তোমরা? তাই আশুতোষ লাটসাহেবকে আবার প্রশ্ন করিলেন,—"আপনি কেবলমাত্র আমার কথা বলিতেছেন, না, 'রেড রোড' দিয়া প্রত্যেক ভারতবাসীর যাতায়াতের অধিকারের কথা বলিতেছেন? আমি কোন ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য আপনাকে ফোন করি নাই, আমার সকল দেশবাসীর জন্যই আপনার মতামত জিজ্ঞাসা করিতেছি।" লর্ড কারমাইকেল বুঝিলেন, এ বড় কঠিন ঠাঁই। লাটসাহেবের হুকুমে সেই দিনই 'রেড রোড' সমান ভাবে দেশীয়-বিদেশীয় সকলের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইল। ইতিপূর্ব্বে এই রাস্তায় কালা আদমী বলিয়া কোন বাঙ্গালী বা ভারতের অন্য কোন প্রদেশবাসীর গাড়ী হাঁকাইয়া যাইবার অধিকার ছিল না। কেবল মাত্র 'রেড' অর্থাৎ ইউরোপীয়রাই অবাধে

এই পথে গাড়ী চালাইয়া যাইতে পারিত বলিয়াই পথটি 'রেড রোড' নামে পরিচিত হয়। আশুতোষের হস্তক্ষেপের ফলেই এই অপমানকর ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়।

এমনই ছিল পুরুষসিংহ আশুতোষের চরিত্রের দৃঢ়তা। দেশের ও জাতির অপমানকে নিজের অপমান বলিয়া মনে করা, দেশবাসীর মর্য্যাদাকে নিজের মর্য্যাদা বলিয়া গ্রহণ করাই ছিল তাঁহার একটা বিশেষত্ব।

আশুতোষের জীবনে এইরূপ দুর্জ্জয় সাহসিকতা ও দেশাত্ম-বোধের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া উহাকে একটি সরকারী যন্ত্রে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, সেই সময় তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড লীটনের নিকট স্যার আশুতোষ যে সমস্ত তেজস্বিতাপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তারপর ১৯২২ সালে ৩রা ডিসেম্বর তারিখে তিনি এক অগ্নিবর্ষী বক্তৃতায় বাঙ্গালার কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিলেন,—"তোমরা এক হাতে দিতে চাও অর্থ, অপর হাতে দাসত্ব। এরূপ দান আমরা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করি। আমরা ব্যয় কমাইব এবং আমাদের আয়ের মধ্যে থাকিবার চেষ্টা করিব। আমরা উপবাসী থাকিব, সারা বাঙ্গালার দুয়ারে দুয়ারে ফিরিয়া ভিক্ষা করিব, তবু এ টাকা আমরা চাই না।" এই বক্তৃতার উপসংহারে তিনি বলিলেন,—"স্বাধীনতাই আমার প্রথম কথা, স্বাধীনতাই আমার দ্বিতীয় কথা এবং স্বাধীনতাই আমার শেষ কথা।"

এইজন্যই আশুতোষকে বলা হয় 'বাঙ্গালার ব্যাঘ্র'। সত্য সত্যই ফরাসী পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি একদিন বলিয়াছিলেন,— "ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করিলে এই বঙ্গীয় শার্দ্দূল ফরাসী-ব্যাঘ্র 'ক্লেমেঁসু' অপেক্ষাও উচ্চতর স্থান অধিকার করিতেন। সমগ্র ইউরোপের কোথাও তাঁহার তুল্য ব্যক্তি নাই।" এই পুরুষসিংহের জীবনকাহিনী কাহার না জানিতে ইচ্ছা হয়?

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একজন খ্যাতনামা ডাক্তার ছিলেন। বাড়ীতে কিছুদূর পর্য্যন্ত লেখাপড়া করিয়া আশুতোষ ১৮৭৪ সালে দশবৎসর বয়সে 'সাউথ সুবারবন স্কুলে' ভর্ত্তি হন। এই সময় হইতেই আশুতোষকে গণিতশাস্ত্রের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত দেখা যায়। স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতেই তিনি এফ. এ. পরীক্ষার পাঠ্য গণিতের বিষয়গুলি প্রায় শেষ করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা (এণ্ট্রান্স) পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আশুতোষ প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। কলেজের ছাত্র হইলেও তিনি সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা হইতে দূরে থাকিতেন। তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। উচ্চতর গণিত শিক্ষার জন্য ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করিলেন। এফ. এ. পরীক্ষার সময় তিনি খুবই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৮০ সালে কেম্ব্রিজের এক গণিত

বিষয়ক পত্রিকায় আশুতোষের কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং ঐ প্রবন্ধগুলিতে যে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বাঙ্গালাকে জগৎ-সমক্ষে বিশেষ মর্য্যাদা দান করে। তাহারই ফলে আশুতোষ বিলাতের এফ, আর, এ, এস, এবং এফ, আর, এস, ই, উপাধি প্রাপ্ত হন। ইতিপূর্ব্বে কোন বাঙ্গালীর ভাগ্যে এই সম্মানজনক উপাধি লাভ ঘটে নাই।

১৮৮৪ সালে আশুতোষ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পর বৎসর এম. এ. পরীক্ষায় গণিতে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ১৮৮৬ সালে তিনি বিজ্ঞানশাস্ত্রে পুনরায় এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলেন এবং প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। ঐ বৎসরই সসম্মানে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং ক্রমশঃ ইহাতে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন। আইন সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তিনি ১৮৯৪ সালে 'ডক্টর অব ল' উপাধি লাভ করেন।

১৮৮৯ সালে লর্ড ল্যান্সডাউনের সময় আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভ্য হন এবং দুই মাস পরেই ২৪ বৎসর বয়সে তিনি সিণ্ডিকেটেরও সভ্য নিযুক্ত হন। এত অল্প বয়সে তাঁহার পূর্ব্বে এই পদ আর কেহ ভূষিত করেন নাই। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি এই পদ অধিকার করিয়া ছিলেন। ১৮৯৯ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর আইনে'র অধ্যাপক-পদ লাভ করেন এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রতিনিধিরূপে সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯০১ সালেও তিনি পুনরায় ঐ পদে নির্ব্বাচিত হন। ১৯০৩ সালে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ও লর্ড কার্জ্জনের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন কমিটির সভ্য নিযুক্ত হন।

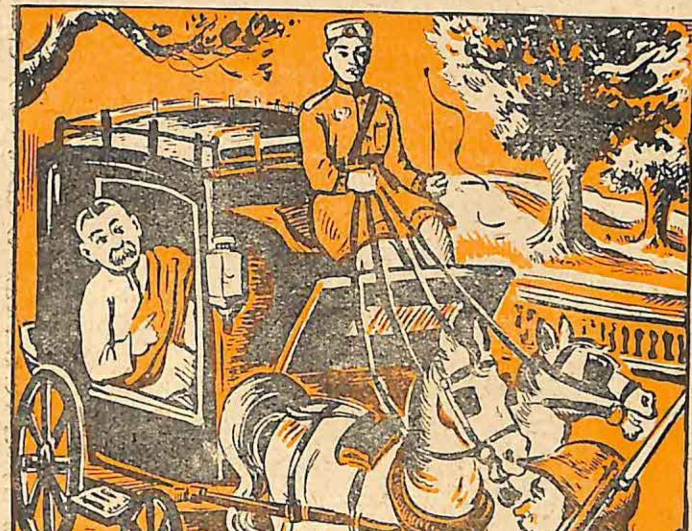
১৯০৬ সাল হইতে ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত আশুতোষ পর পর চারিবার তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হন। ঐ কয় বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আশুতোষ তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বর্ত্তমান রূপে রূপায়িত করিয়া গিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গগনস্পর্শী দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং, ইহার পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগ, প্রাসাদোপম বিজ্ঞান-কলেজ, চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিন, ছাত্রদিগের বাসোপযোগী বিরাটকায় হার্ডিঞ্জ হোস্টেল এবং সর্ব্বোপরি বঙ্গভাষাকে শিক্ষণীয় বিষয়রূপে প্রবর্ত্তন ও পৃথিবীর নানা দেশীয় ভাষা ও নানা বিদ্যার একত্র সমাবেশ প্রভৃতি আশুতোষকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, প্রাচীন কীর্ত্তি উদ্ধার ও প্রাচ্য ভাষার অনুশীলনের জন্য তিনি সমস্ত পৃথিবীর শিক্ষিতমণ্ডলীকে বাঙ্গালার এই মূল শিক্ষা-নিকেতনে আহ্বান করিয়াছেন। এইরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি সত্য সত্যই একটি আন্তর্জ্জাতিক মিলনকেন্দ্রে পরিণত করিয়া গিয়াছেন।

১৮৯১ সালে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিলে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হয়।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যুবক আশুতোষ দমিলেন না ; তিনি কঠোরতর দৃঢ়তা সহকারে অগ্রসর হইলেন। ক্রমে তাঁহার চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষা প্রবেশিকা হইতে এম. এ. পর্য্যন্ত অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়-রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত হইল। মাতৃভাষাকে পৃথিবীর সাহিত্যক্ষেত্রে যোগ্য স্থান দেওয়াই ছিল বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ সাধক আশুতোষের শ্রেষ্ঠতম সাধনার বিষয়। বঙ্গভাষায় তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু সাহিত্যিক সৃষ্টির উপায় করিয়া গিয়াছেন। আশুতোষ বাঙ্গালী জাতিকে ভালবাসিতেন ; বাঙ্গালীর সবকিছুই তাঁহার নিকট চির আদরের বস্তু ছিল।

বাল্যকাল হইতেই হাইকোর্টের জজ হওয়া ছিল আশুতোষের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা এবং সত্য সত্যই তিনি ১৯০৪ সালে হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইলেন। ১৯২০ সালে তিনি কিছুকালের জন্য অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির কার্য্যও করিয়াছিলেন। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি হাইকোর্ট হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বিচারপতি হিসাবে তিনি অপূর্ব্ব ন্যায়নিষ্ঠা ও যথেষ্ট সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন।

আশুতোষ কর্ম্মী হিসাবে দেশহিতকর প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের সহিতই বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বহু কমিটির সভাপতি ছিলেন এবং প্রত্যেকটিরই কার্য্য খুব ভালভাবে পরিচালনা করিতেন। তিনি তিনবার এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হইয়াছিলেন। আদর্শ ও কর্ম্মকুশলতার এরূপ মিলন খুবই বিরল। দ্বারভাঙ্গা ভবনে আশুতোষের



......তাঁহার রোষনেত্র তুলিয়া বলিলেন,—জানিস্, আমি কে?

মর্ম্মরমূর্ত্তি উন্মোচনের উৎসব-দিবসে বাঙ্গালার লাট লর্ড কারমাইকেল বলিয়াছিলেন,—"কোন একটা জিনিষ সম্বন্ধে বিরাট কল্পনা করিবার শক্তি আশুতোষের ছিল, কিন্তু সেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি অনেকের নাই, আশুতোষের তাহাও ছিল।"

আশুতোষ সরলহৃদয় ও অনাড়ম্বর ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট হাউসে লাট সাহেবের নিকট যাইতেও তিনি ধুতি-চাদর পরিয়াই যাইতেন। বাঙ্গালীর নিজস্ব পোষাক পরিধান করিয়া চলাফেরা করিতে, বাঙ্গালীর নিজস্ব ভাষায় কথা বলিতে ও বক্তৃতা দিতে তিনি গৌরব বোধ করিতেন। মোটের উপর তিনি আমরণ বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। সামান্য একটিমাত্র ঘটনা হইতেই তাঁহার স্বাজাতিকতা-বোধের সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে। স্যাডলার কমিশনের অন্যতম সদস্যরূপে একমাত্র তিনিই ঐ কমিশনের সঙ্গে সাধারণ বাঙ্গালীর পোষাকে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। কমিশনের সভ্যগণের সম্মানার্থে মহীশূর-দরবার একটি ভোজ-সভার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আশুতোষ নগ্নমস্তকে নিজস্ব বেশেই ভোজ-সভায় গিয়া উপস্থিত হইলে মহীশূরের প্রধানমন্ত্রী তাঁহাকে কিছুকালের জন্য একটি উষ্ণীষ পরিধান করিতে অনুরোধ করেন। আশুতোষ জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে একটি সংক্ষিপ্ত উত্তরে বলিলেন,—"আমি তাহা পারিব না। কোথাও বাঙ্গালীর বেশ পরিত্যাগ করি নাই, এখানেও তাহা করিব না।" এই বলিয়া তিনি একেবারে

নিজের বাসায় গিয়া হাজির। ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া মহীশূররাজ ব্যক্তিগত অনুরোধসহ নিজ পুত্রকে পাঠাইয়া দিলে বাঙ্গালী আশুতোষ সগৌরবে ক্ষমার হাসি হাসিতে হাসিতে ভোজ-সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই ঘটনার জন্য মহারাজার নিকট প্রধানমন্ত্রীকে তিরস্কার শুনিতে হইয়াছিল। আশুতোষের জীবনে এইরূপ নির্ভীকতা ও গভীর স্বাদেশিকতার এমন বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে যাহা কোন পরাধীন দেশে সচরাচর দেখা বা শোনা যায় না। একবার পূর্ব্বোক্ত স্যাডলার কমিশনের কোন কার্য্যোপলক্ষে তিনি আলিগড় গিয়াছিলেন। ফিরিবার পথে তিনি ট্রেনের যে কামরায় আসিতেছিলেন সেই কামরায় একজন ইংরেজ 'মিলিটারী অফিসার' ছিলেন। কিছুদূর আসিতেই আশুতোষ তন্দ্রামগ্ন হইলেন। এমনি সময়ে সেই ইংরেজ অফিসারটি তাঁহার একটি নাগ্‌রা জুতা বাহিরে ফেলিয়া দিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে নিজেও ঘুমাইয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে ঘুম ভাঙ্গিতেই আশুতোষ তাঁহার একটি জুতা না দেখিয়া অনায়াসে ব্যাপারটা বুঝিয়া ফেলিলেন এবং সেই মুহূর্ত্তেই সাহেবের কোটটিও বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। একটু পরেই সাহেবের ঘুম ভাঙ্গিল। তিনি নিজের কোটটি না দেখিয়া খুব তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। আশুতোষ গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"তোমার কোট আমার জুতা আনিতে গিয়াছে।" সাহেব এই উত্তর শুনিয়া একেবারে চুপ।

আশুতোষ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার পুস্তক ক্রয় করিয়াছিলেন

এবং এই সমস্ত পুস্তক ভালভাবেই পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি এই বিরাট পুস্তকালয়ের নাম দিয়াছেন 'বাণীমন্দির'। এই 'বাণীমন্দির' বাঙ্গালীর একটি গৌরবের বস্তু। ইহা ব্যতীত তিনি কন্যা কমলা ও মাতা জগত্তারিণী দেবীর স্মৃতি-রক্ষার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে কিছু টাকা দান করেন। ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য কোন উপযুক্ত পুরুষ অথবা নারীকে প্রতি বৎসর নির্ব্বাচিত করিয়া 'কমলা-স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডার' হইতে নির্দ্ধারিত অর্থ দেওয়া হয়। আর 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রতি দুই বৎসর অন্তর শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী লেখক অথবা লেখিকাকে পুরস্কাররূপে দেওয়া হয়।

আশুতোষ তাঁহার মাতাকে দেবীর ন্যায় ভক্তি করিতেন। এমন কি, তাঁহার কথা ব্যতীত এক পা-ও অগ্রসর হইতেন না। তিনি তাঁহার মাতাকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন নিম্নলিখিত গল্পটি তাহার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। ১৯০২ সালে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেকের সময় সেই সময়কার গভর্ণর-জেনারেল লর্ড কার্জ্জন তাঁহাকে বিলাত যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। উত্তরে আশুতোষ তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাঁহার মাতার ইচ্ছা নয় যে, তিনি বিলাত যান। ইহাতে লর্ড কার্জ্জন তাঁহাকে বলিলেন, "তিনি যেন তাঁহার জননীকে জানান যে, স্বয়ং বড়লাট এবং রাজপ্রতিনিধি তাঁহার পুত্রকে যাইতে আদেশ করিতেছেন।" প্রত্যুত্তরে আশুতোষ ধীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে তাঁহাকে বলিলেন,—"আশুতোষ তাঁহার মাতার কথার বিরুদ্ধে কিছুই

করিতে রাজী নহেন, সে আদেশ স্বয়ং রাজপ্রতিনিধিরই হউক অথবা তাঁর চেয়েও বড় আর কাহারও হউক।"

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হইলেও আশুতোষ সঙ্কীর্ণমনা রক্ষণশীল ছিলেন না। যাহা কুসংস্কার বলিয়া মনে করিতেন, সমাজ ও জাতির কল্যাণের জন্য তিনি নির্ভয়ে তাহার প্রতিবাদ করিতেন এবং নিজেই এমন কিছু করিতেন যাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণে দেশবাসিগণ উদ্বুদ্ধ হইতে পারে। বহু বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি তাঁহার বিধবা কন্যা কমলার বিবাহ দিয়াছিলেন।

আশুতোষ ১৯২১ সালে পঞ্চমবার ভাইস-চ্যান্সেলার হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্য্যকাল ছিল ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত। তাঁহার প্রাণ ছিল ছাত্র-গত। কত ছাত্রকে যে কতভাবে তিনি সাহায্য করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সময়ে আশুতোষ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রসমাজ এক ও অভিন্ন হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল।

১৯২৪ সালে তিন দিন রোগভোগের পর বাঙ্গলা মায়ের কৃতী সন্তান আশুতোষ পাটনাতে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃতদেহ সেই দিনই কলিকাতায় আনয়ন করা হয়। জনসাধারণ ও ছাত্রসমাজ বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া মৃত মনীষীর প্রতি যে সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাইয়াছে, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।



সর্ব্বত্যাগী সাধক

সাদা মানুষদের দেশ ইংল্যাণ্ড। সেখানে একটি সভা হইতেছে। সভায় বহু ভারতীয় ছাত্র—কালো মানুষের দেশের ছেলেরা উপস্থিত থাকিয়া সেই সভায় বক্তৃতা শুনিতেছেন। সভায় বক্তৃতা দিতেছিলেন সেই সাদা মানুষদের দেশেরই একজন লোক—তাঁহার নাম জেম্‌স্ ম্যাকলিন। ম্যাকলিন

সাহেব পার্লামেণ্টের সভ্য। বক্তৃতা দিতে দিতে তিনি ভারতবর্ষের নিন্দা করিয়া বলিলেন, "ভারতের আবার সভ্যতা কোথায়? ভারতের ইতিহাস তো গোলামীর ইতিহাস!"

কথাটা শুনিয়া সভায় উপস্থিত ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব, একটু আপত্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু কেহই ম্যাকলিন সাহেবের কথার উপযুক্ত জবাব দিবার সাহস করিলেন না।

হঠাৎ দেখা গেল একটি বাঙ্গালী যুবক ম্যাকলিন সাহেবের মন্তব্যের প্রতিবাদে একেবারে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। যুবক সভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিলেন, ম্যাকলিন সাহেবের কথার প্রতিবাদ করিলেন ওজস্বী ভাষায়। জন্মভূমির অপমান যুবকের প্রাণে বড় লাগিয়াছিল, তাই তিনি নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া ম্যাকলিন সাহেবের মন্তব্যের কঠোর উত্তর দিলেন—প্রমাণ করিলেন যে, ভারতও সভ্য, ভারতেরও সভ্যতা আছে, সংস্কৃতি আছে। ইংল্যাণ্ড সভ্য হওয়ার বহু পূর্ব্বেই ভারতে সভ্যতার অরুণোদয় হইয়াছিল, সভ্যজগতে ভারত অতি প্রাচীন কালেই একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়াছিল। সেদিন ঐ বাঙ্গালী যুবক একথাটা শুধু প্রমাণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, যুবক সেদিন ম্যাকলিন সাহেবকে ক্ষমা চাহিতে পর্য্যন্ত বাধ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তি-তর্কে আর দেশপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া ম্যাকলিন সাহেবকে ভারত সম্বন্ধে তাঁহার অপমানকর উক্তি প্রত্যাহার করিয়া লইতে হইয়াছিল।

সেই সময়েই এই ভারত হইতে—এই কালোর দেশ হইতে আর একজন তেজস্বী পুরুষসিংহ ইংল্যাণ্ডে গিয়াছিলেন। তাঁহার নাম দাদাভাই নৌরজী। দাদাভাই নৌরজী ঠিক করিলেন যে, তিনি পার্লামেণ্টের সভ্য হইবেন। একজন ভারতীয় ইংল্যাণ্ডের আইন-সভা পার্লামেণ্টের সভ্য হইবেন এ জিনিষটা অনেক ইংরেজের ঠিক মনঃপূত হইল না। তাই দাদাভাই নৌরজীর বিরুদ্ধে সে দেশে প্রচারকার্য্য চলিতে লাগিল। একদিন এমনিতর প্রচারকার্য্য চালাইতে গিয়া লর্ড স্যালিসব্যারি নামে একজন ইংরেজ তাঁহার এক বক্তৃতায় ভারতবাসীদের নিন্দা করিয়া বলিলেন,—"ভারতীয়েরা দাস-মনোভাবাপন্ন জাতি বৈ আর কিছুই নহে। সুতরাং কোন ভারতীয় ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টের সভ্য হইবেন ইহা অসম্ভব, ইহা অসহনীয়। ভারতীয়েরা ইংল্যাণ্ডের মত স্বাধীন দেশের আইন-পরিষদের সভ্য হইবার অযোগ্য,…" ইত্যাদি।

স্যালসব্যারির এই কথায় স্বদেশভক্ত তেজস্বী ঐ যে বাঙ্গালী যুবক যিনি ম্যাকলিন সাহেবের মন্তব্যের উপযুক্ত জবাব দিয়া ম্যাকলিন সাহেবকে ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়াছিলেন —তাঁহার আত্মসম্মানে বড় আঘাত লাগিল। স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর অপমানের কথা শুনিয়া তিনি এবারেও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন যে, "ভারত-মাতার সন্তান আমি। সাহেব ভারতীয়দের লক্ষ্য করিয়া যে অপবাদ বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা যদি আমি মিথ্যা

বলিয়া প্রমাণ করিতে না পারিলাম তবে আমি ভারতসন্তান কিসে ?"

অতঃপর দাদাভাই নৌরজীর পক্ষ সমর্থন করিয়া এই বাঙ্গালী যুবক অতিশয় স্পষ্ট এবং তীব্র ভাষায় ইংল্যাণ্ডের নানাস্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—ভারতীয়দের সম্বন্ধে লর্ড স্যালিসব্যারি যে অপমানকর কথা বলিয়াছিলেন তাহার প্রতি-বাদ করিয়া বক্তৃতার দ্বারা তিনি ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে লাগিলেন।

যুবকের বক্তৃতা শুনিয়া ইংরেজেরা অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, একজন ভারতীয়—যাহাদের আমরা অবজ্ঞা করি, তাহার মধ্যে এত তেজ! তাঁহারা দেখিলেন যে, পরাধীন ভারতবাসীর মনের মধ্যেও স্বাধীন চিন্তাধারা ফল্গুস্রোতের মতই প্রবাহিত হইতেছে। ভারতীয়রাও স্বাধীন-মনোভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম—ন্যায়-অন্যায় বিচারের ক্ষমতা, স্বাধীনতার মর্য্যাদাবোধ—এ সবই ভারতীয়দের মধ্যেও আছে। এই যুবকের যুক্তি-তর্ক শুনিয়া ইংরেজেরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, লর্ড স্যালিসব্যারি যাহা বলিয়াছেন তাহা মিথ্যা এবং এই যুবকের চেষ্টাতেই শেষ পর্য্যন্ত দাদাভাই নৌরজী ইংল্যাণ্ডের আইন-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

এই সে বাঙ্গালী যুবক—যিনি ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে দেশের সুনাম আর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন—ইনিই চিত্তরঞ্জন দাশ। স্বদেশকে ইনি বড়

ভালবাসিতেন। তাঁহার দেশসেবায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার দেশবাসী 'দেশবন্ধু' এই নাম-সম্মানে তাঁহাকে ভূষিত করিয়াছিলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালীর প্রাণে গভীর দেশপ্রীতি এবং আত্মসম্মান জাগাইয়া দিয়াছিলেন। আজ আমরা দেশের দিকে চাহিতে শিখিয়াছি, দেশের মর্য্যাদা বুঝিয়াছি। এ সকলেরই মূলে আছে দেশবন্ধুর সাধনা। তাঁহারই সোণার কাঠির স্পর্শে আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মত বাঙ্গালার কোটি কোটি নর-নারীর মনে নব-জাগরণের প্রভাতী-আলোর রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

চিত্তরঞ্জনের দেশপ্রেম ছিল অকৃত্রিম, তাঁহার তেজ ছিল আগুনের মত—যেমনি প্রখর, তেমনি ভাস্বর। বাঙ্গলা অথবা বাঙ্গালীকে, কিংবা ভারতবর্ষ অথবা ভারতবাসীকে কেহই তাঁহার সম্মুখে নিন্দা করিয়া এড়াইয়া যাইতে পারিত না। স্বদেশ অথবা স্বদেশবাসী—কাহারও নিন্দা শুনিলে তিনি তখনই বাঘের মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ৫ই নবেম্বর চিত্তরঞ্জনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ভুবনমোহন দাশ একজন প্রসিদ্ধ এটর্ণী ছিলেন। তাঁহাদের আদি বাসস্থান ছিল ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেলিরবাগ গ্রামে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে সসম্মানে বি. এ. পাশ করিয়া চিত্তরঞ্জন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য ইংল্যাণ্ডে যান। কিন্তু চিত্তরঞ্জন ছেলেবেলা হইতেই স্বাধীনচেতা ছিলেন। তিনি সেখানে ভারত সম্বন্ধে একটি

উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। ইহাতে তিনি কর্তৃপক্ষের অসন্তোষ-ভাজন হন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া দেশে ফিরিলেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। প্রথমে তাঁহার তেমন পসার হয় নাই। কিন্তু বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলার সময় তিনি দেশের সুসন্তান শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যেরূপ গভীর আইন-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে চারিদিকে তাঁহার নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। অরবিন্দ মুক্তি পাইলেন, চিত্তরঞ্জনেরও অর্থ-উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত হইল। শুনা যায় সেই সময় পৃথিবীর মধ্যে যে কয়জন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার বেশী টাকা উপার্জ্জন করিতেন, চিত্তরঞ্জন ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন।

মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ-আন্দোলন আরম্ভ করিলে চিত্তরঞ্জন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। রাজার ঐশ্বর্য্য, ভোগ-বিলাস ত্যাগ করিয়া তিনি পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই অবধি তিনি দেশজননীর সেবায় সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

দেশসেবার ব্যাপারে বরাবরই তিনি ছিলেন অগ্রণী। দেশের কল্যাণকর সমস্ত কার্য্যের সহিত তিনি নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি চরমপন্থী ছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ভবানীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি সভাপতিত্ব

করিয়াছিলেন। দেশের জন্য তাঁহাকে কয়েকবার কারারুদ্ধও হইতে হইয়াছে। চিত্তরঞ্জন গয়া কংগ্রেসের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার অতুলনীয় দেশসেবায় ও ত্যাগে বাঙ্গালী—শুধু বাঙ্গালী কেন সমস্ত ভারতবাসী মুগ্ধ হইয়াছিল। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়ররূপে তিনি দরিদ্রনারায়ণ-সেবার যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। কলিকাতা মহানগরীর উন্নতির জন্য তিনি এত কাজ করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

তাঁহার পিতার অনেক ঋণ ছিল। দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় তিনি সেই ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য ছিলেন না। কিন্তু চিত্তরঞ্জন এরূপ সত্যপরায়ণ ছিলেন যে, তিনি পিতার সমস্ত ঋণ শোধ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। তথাপি যাহা তিনি ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার দানের তুলনা হয় না। তাঁহার দানের উপর বহু পরিবারের জীবন নির্ভর করিত। অনেক দরিদ্র ছাত্র তাঁহার সাহায্যে লেখাপড়া শিখিয়াছে। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার কলিকাতার বাসভবনটি পর্য্যন্ত জাতিকে দান করিয়া গিয়াছেন। উহাই 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' নামে তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

দেশবন্ধু শুধু স্বদেশপ্রেমিক ও দানশীলই ছিলেন না, তিনি সুসাহিত্যিক এবং কবিও ছিলেন। তাঁহার 'সাগরসঙ্গীত'

একখানি প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ। 'নারায়ণ' নামক মাসিক-পত্রের তিনি পরিচালক ও সম্পাদক ছিলেন।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন মঙ্গলবার দার্জ্জিলিঙে বঙ্গজননীর এই শ্রেষ্ঠ সন্তান মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার শব কলিকাতায় আনীত হয় এবং কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁহার সৎকার হয়। সেই শবানুগমনে যেরূপ লোকের সমাবেশ হইয়াছিল, এদেশে ইতিপূর্ব্বে কোন রাজা, মহারাজা বা দেশনেতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সেরূপ হয় নাই। লক্ষ লক্ষ লোক সেই শবযাত্রায় যোগদান করিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া দীনহীন কুটীরবাসী পর্য্যন্ত দেশবন্ধুর শেষ দর্শনের জন্য ব্যাকুল! অনেক ইয়োরোপীয়ও নগ্নমস্তকে ও নগ্নপদে শবানুগামী হইয়া এই জননেতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের চরিত্রে বাঙ্গালীসুলভ কয়েকটি বিশিষ্ট গুণের অপূর্ব্ব সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তাঁহার দানশীলতায়, কবিত্বে এবং সঙ্গীতপ্রিয়তায় আমরা বাঙ্গালী হৃদয়ের অন্তর্নিহিত কোমলতার পরিচয় পাই। তাঁহার ক্ষুরধার বুদ্ধি ও সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা বাঙ্গালী মনীষার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ। সংগ্রামক্ষেত্রে তিনি ছিলেন কঠোর-হৃদয় দুর্দ্দমনীয় বীর। একদিকে তিনি বজ্র অপেক্ষা কঠোর, অপর দিকে তিনি কুসুম হইতেও কোমল। কেবলমাত্র ক্ষণজন্মা মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের চরিত্রেই এই সমুদয় পরস্পরবিরোধী গুণের সংমিশ্রণ ঘটে। চিত্তরঞ্জনের অমর

স্মৃতিকে বিশ্বকবির অমর লেখনী দুইটি মাত্র কথায় চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে ঃ—

"এনেছিলে সাথে ক'রে
মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান।"





সৈয়দ আমীর আলী

দেশসেবক মনীষী

হুগলী স্কুলের তুইটি ছাত্র-বন্ধু স্কুলের লাইব্রেরী-হলে সেই দিনকার একখানি সংবাদপত্র খুলিয়া পাঠ করিতেছে। হঠাৎ একজনের চোখে বিদেশ-প্রত্যাগত একজন কৃতী মুসলমান

ব্যারিষ্টারের একটি সচিত্র ছোট সংবাদ চোখে পড়িতেই সে সেই দিকে তাহার বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিল ঃ "ভাই, আমাদের দেশে, বিশেষ করিয়া মুসলমান-সমাজে, আজ এমন কয়েকজন আইনজ্ঞ দরকার হইয়া পড়িয়াছে যাঁহারা নিজেদের উদ্যোগে ও পরিশ্রমে সমাজকল্যাণমূলক নানারূপ আইন-কানুন করিয়া স্ব-সম্প্রদায় ও জাতিকে প্রাণবান করিয়া তুলিতে পারেন।"

—তুমিই হও না ভাই তেমনি একজন।

সত্যিই আমার খুব বড় একজন আইনজ্ঞ ব্যারিষ্টার হইবার সখ। আমার ইচ্ছা, আমি নানা দেশের সমাজ-ব্যবস্থা ও আইন-কানুন সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া উহা আমার দেশবাসীর কল্যাণে প্রয়োগ করি।

যুবকের এই আকাঙ্ক্ষা সত্য-সত্যই পূর্ণ হইয়াছিল। শুধু ইহাই নহে, ভবিষ্যৎ জীবনে ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া এবং বিলাতে প্রিভি-কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হইয়া স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

দেশে মাঝে মাঝে প্রতিভাবান লোকের সন্ধান মিলে, কিন্তু কর্ম্মনিষ্ঠার সহিত মনীষার সম্মিলন বাস্তবিক বিরল। যে কয়জন বাঙ্গালী তাঁহাদের প্রতিভার এইরূপ সদ্ব্যবহার করিয়া অমরত্বের অধিকারী হইয়াছেন, সৈয়দ আমীর আলী তাঁহাদের অন্যতম।

হুগলী জেলার চুঁচুড়া শহরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে ১৮৪৯ সালে সৈয়দ আমীর আলী জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই কথাবার্ত্তায়, চালচলনে পুত্রের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া পিতা যথাকালে তাঁহার শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন এবং হুগলী স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। স্কুলের সমস্ত পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় আমীর আলী বৃত্তি লাভ করেন। মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার শেষ সোপান পার হইতে সমর্থ হন। তাঁহার ছাত্র-জীবনের প্রতিভার আরও পরিচয় এই যে, ১৮৬৭ সালে বি. এ. পাশ করিয়া তিনি তাহার পর বৎসরই এম. এ. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং যথাসময়ে আইন পরীক্ষায়ও কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়া হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। দিন দিন তাঁহার পসারও বেশ জমিতে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র আমীর আলী এইভাবে ছাত্র-জীবন শেষ করিয়া কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিলেন বটে কিন্তু তিনি কেবলমাত্র অর্থোপার্জ্জনেই পরিতৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না। আইন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিল ; সঙ্গে সঙ্গে তিনি আশা-পূরণের সুযোগও পাইলেন। সেই সময় এখনকার মত এত ব্যারিষ্টার ছিল না। খুব কম লোকই তখনকার দিনে দেশের মাটি ছাড়িয়া সাগর পাড়ি দিতেন। তখন গভর্ণমেণ্টই নিজেদের উদ্যোগে বিশেষ বৃত্তি দিয়া মেধাবী ছাত্রদিগকে ব্যারিষ্টারী

পড়াইবার জন্য বিলাতে পাঠাইতেন। এইরূপ একটি বৃত্তি লইয়া সৈয়দ আমীর আলী বিলাতে গেলেন। অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং পুনরায় কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন।

সৈয়দ আমীর আলী তখন সবেমাত্র তেইশ কি চব্বিশ বৎসরের তরুণ যুবক। ইহারই মধ্যে তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার জ্ঞানের দীপ্তি, বুদ্ধির প্রখরতা ও চিত্তের উদারতা কি দেশীয়, কি বিদেশীয় সকলকে বিমোহিত করিল। বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান তাঁহার সমর্থন, সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। ইনিও তেমনি যেখানে যেমনভাবে ও যতটা সম্ভব এই সকল প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে লাগিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্ব্বাচিত করা হইল। পরের বৎসরই কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের মুসলমান-আইনের অধ্যাপক মনোনীত হইয়া পাঁচ বৎসরকাল তিনি অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন। এই সময় হইতে সৈয়দ আমীর আলী সাহেব মুসলমান-সম্প্রদায়ের সর্ব্ববিধ উন্নতি-সাধনে উদ্যোগী হন। এইরূপে তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের গণতান্ত্রিক দিকের সুরু হইল। তিনি একটিমাত্র কাজে নিজেকে চিরকাল আবদ্ধ রাখিতে ভালবাসিতেন না, তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা ও বিচক্ষণতার বলে পর পর বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া তিনি পরম আনন্দ লাভ করিতেন। ১৮৭৬

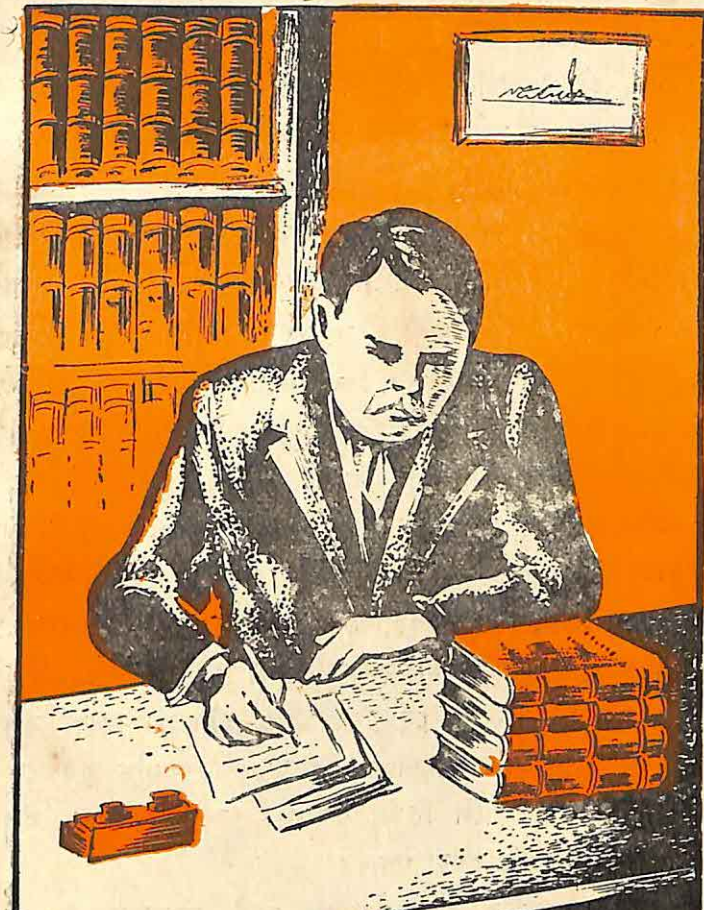
সালে তিনি 'কেন্দ্রীয় জাতীয় মুসলমান সঙ্ঘ' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল এই সমিতির সম্পাদক-রূপে অশেষ পরিশ্রম করিয়া তিনি দেশের জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া মুসলমান-সম্প্রদায়ের, বহু অভাব-অভিযোগ বিদূরিত করেন। হুগলীতে দানবীর হাজী মহম্মদ মহসীন প্রতিষ্ঠিত যে সুবিখ্যাত 'ইমামবারা' রহিয়াছে, তিনি দীর্ঘকাল উহার কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের সভাপতি ছিলেন।

ব্যারিষ্টারী ও অধ্যাপনা করিলেও, গভর্ণমেণ্টের উচ্চ চাকুরীতেই সৈয়দ আমীর আলী বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া পাঁচ বৎসর হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিবার পর ১৮৭৮ সালে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কলিকাতার অন্যতম প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োগ করেন। বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেওয়ায় তাঁহাকে অস্থায়ীভাবে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত করা হইল। সরকারী বাঁধাধরা নিয়মে বাহিরের গঠনমূলক কার্য্যাদি বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া এই চাকুরীতে তাঁহার মন বসিল না। যখন তাঁহার এই চাকুরী পাকা হইবার কথা হইতেছিল, ঠিক সেই সময় তিনি অকাতরে এই উচ্চ পদ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। আইন-সভায় প্রবেশ করিয়া তিনি জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে স্বদেশের কল্যাণসাধনে বিশেষভাবে মনোযোগী হন। তিনি

১৮৮৩ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে আসীন ছিলেন এবং পরে কেন্দ্রীয় (ভারতীয়) ব্যবস্থা-পরিষদেরও সদস্য হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায়ই 'ওয়াকফ্' আইনের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন হইয়াছিল। ইহাতে ভারতীয় মুসলমানগণ বিশেষ উপকৃত হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে 'ঠাকুর আইনের অধ্যাপক' নিযুক্ত করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার প্রতিভার সমাদর করেন।

ইতিমধ্যে আইন-বিষয়ে সৈয়দ আমীর আলীর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সংবাদ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। গুণমুগ্ধ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করিতে আহ্বান করিলেন। দীর্ঘ ১৪ বৎসরকাল এই দায়িত্বপূর্ণ পদে সমাসীন থাকিয়া তিনি বিচারকার্য্যে যে ধীরতা, বিচক্ষণতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অনেক সময় তাঁহার ইয়োরোপীয় সহকর্ম্মীদের বিস্ময় উৎপাদন করিত। ১৯০৪ সালে তিনি গৌরবের সহিত এই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৮৭ সালে তিনি ভারত-সরকার কর্ত্তৃক সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত হন।

সৈয়দ আমীর আলীর কর্ম্মবহুল জীবনের মধ্যে একটা বড় জিনিষ লক্ষ্য করিবার ছিল এই যে, তিনি যেন সব সময়েই ভাবিতেন, কি করিয়া বাঙ্গালীকে তথা ভারতবাসীকে বিশ্বের দরবারে গৌরবের অধিকারী করা যায়। বাঙ্গালী কিসে ছোট, একজন ইয়োরোপীয় বা একজন আমেরিকানই বা কিসে বড়—



পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে রত সৈয়দ আমীর আলী

ইহাই যেন ছিল তাঁহার কাছে আসল প্রশ্ন। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তিনি চেষ্টা করিয়াছেন এই দৃষ্টান্ত দেখাইতে যে, ইচ্ছা, চেষ্টা ও কর্ম্মনিষ্ঠা থাকিলে বাঙ্গালীও যে-কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম, বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালীও সকলের সমান হইয়া চলিতে পারে।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সৈয়দ আমীর আলী বিলাতে গমন করেন। তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি বিলাতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রবাসে থাকিয়াও তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীর কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। ইংল্যাণ্ডে থাকিয়াই তিনি তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব লাভ করেন। ১৯০৯ সালে আমীর আলী সাহেব বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ বিচারসভা প্রিভি-কাউন্সিলের সদস্য-পদে নিযুক্ত হইয়া দেশের ও জাতির কল্যাণ সাধনের সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোনও ভারতবাসী এই উচ্চ সম্মানের অধিকারী হইতে পারেন নাই। ইহা দ্বারা তিনি নিজেই যে গৌরবান্বিত হইয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার জন্মভূমি ভারতবর্ষেরও ইহাতে গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। বিলাতে থাকা কালে তিনি তথাকার 'ভারতীয় মুস্লিম লীগ' শাখারও সভাপতি হইয়াছিলেন।

সৈয়দ আমীর আলী একজন খাঁটি মুসলমান ছিলেন। সহিষ্ণুতা ও অমায়িকতা তাঁহাকে সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়াছিল। ইস্লাম ধর্ম্মের মহত্ত্ব প্রচারের জন্য তিনি আজীবন পরিশ্রম

করিয়াছেন। মুসলমান আইন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইংরেজীতে তাঁহার অনেকগুলি অমূল্য গ্রন্থ আছে। আইন ও ধর্ম্ম বিষয় ছাড়া ইতিহাস এবং সাহিত্যচর্চ্চার প্রতিও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ইংরেজী ভাষায় ইতিহাস ও সাহিত্য সম্বন্ধেও তিনি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে সৈয়দ আমীর আলী অন্যতম। ১৯২৯ সালে তিনি স্বীয় জীবনের ব্রতসমূহ সমাপ্ত করিয়া তাঁহার বিলাতের বাসভবনে ইহলীলা সংবরণ করেন। দেশ ও জাতি বাঙ্গলার এই সুসন্তানের পুণ্যস্মৃতি চিরকাল শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করিবে। কলিকাতার নাগরিকগণ 'সৈয়দ আমীর আলী এভিনিউ' নামে একটি সুপ্রশস্ত রাস্তার নামকরণ করিয়া পরলোকগত মনীষীর প্রতি তাহাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছে।





সত্যদর্শী বৈজ্ঞানিক

১৯০০ খৃষ্টাব্দ। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারি নগরীতে বৈজ্ঞানিকদের মহাসভা বসিয়াছে। এই সভায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। তাঁহারা সকলে একত্রে একই সভায় বসিয়া নিজ নিজ বিদ্যার পরিচয় দিবেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ পদার্থবিদ্, কেহ রাসায়নিক, আবার কেহ নৃতত্ত্ববিদ্

ইত্যাদি ; জাতিতে কেহ বা জার্ম্মাণ, কেহ বা রুশীয়, কেহ বা ইংরেজ, আবার কেহ বা আমেরিকাবাসী, সকলেই পশ্চিম মহাদেশীয় মনীষী। আর হইবে নাই বা কেন ? বিজ্ঞানের নবজন্ম তো পশ্চিম মহাদেশেই হইয়াছে। কাজেই সেখানকার অধিবাসীরা যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারে অগ্রণী হইয়াছেন, তেমনি তাহার ফলভোগও তাঁহারাই অগ্রে করিয়াছেন।

এক একদিন এক এক বিভাগের সভা হইতে লাগিল, আর তাহাতে পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের গবেষণার ফল সকলের সম্মুখে প্রমাণিত করিয়া দিয়া জগৎকে অবাক করিয়া দিতে লাগিলেন।

হঠাৎ ডাক পড়িল পূর্ব্বদেশীয় এক নবীন বৈজ্ঞানিকের। সভাস্থ সকলে উৎসুক হইয়া উঠিলেন। সকলের মনেই একটা অশ্রদ্ধার ভাব।

আর তাঁহাদেরই বা দোষ কি ? তাঁহারা তো দেখিয়া আসিয়াছেন, বিজ্ঞান-লক্ষ্মী পশ্চিমদেশীয় লোকের ঘরেই চিরকাল বাঁধা। ইহারই মধ্যে এমন কী অঘটন ঘটিল যে, একজন সাধারণ ভারতীয়কে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের সভায় শুধু আসনই দেওয়া হয় নাই, নিজের গবেষণার ফল প্রমাণেরও সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

সভাস্থল নিস্তব্ধ, সকলেই কিঞ্চিৎ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন।—কে সেই ভাগ্যবান পুরুষ ? ধীরে ধীরে সভাপতির মঞ্চের দিকে এক বিয়াল্লিশ বৎসর বয়স্ক সৌম্যদর্শন ভারতীয়

বৈজ্ঞানিক অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সকলের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল।

প্রথমে তাঁহার সংশয় ছিল, হয়ত তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সমবেত বৈজ্ঞানিকদের কাছে নিতান্ত উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি মন স্থির করিলেন। দুঃখিনী ভারতমাতার মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। তিনি স্পষ্ট দেখিলেন—হয় আজ জয়লাভ, নয় চিরকালের জন্য ভারতের গৌরব-রবি অস্তমিত! আত্মবিশ্বাসে নির্ভর করিয়া ভারতের ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করিয়া তিনি নিজের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণ করিয়া চলিলেন। অবশেষে বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার গলায় মাল্য প্রদান করিলেন।

সভামধ্যে অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। কেহ বা বিশ্বাস করিলেন, আবার কেহ করিলেন না; কিন্তু কাহারও এমন সাধ্য হইল না যে, তাঁহার প্রমাণিত বিষয় মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেন।

বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী ভাবিতে ভাবিতে ঘরে ফিরিলেন। সকলের মুখেই এক কথা—হ্যাঁ, ভারতীয়েরা শুধু দর্শন জানেন না, বিজ্ঞান-জগতেও তাঁহারা নূতন জিনিষ দিতে পারেন। ভারতবর্ষ শুধু একজন স্বামী বিবেকানন্দকেই জন্ম দিতে পারে এমন নয়, সে দেশে ডাঃ জগদীশ বসুর মত সত্যদর্শী বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাবও সম্ভব।

তখন সবেমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভায়

হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করিয়া পৃথিবী ঘুরিয়া বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছেন, বিশ্বময় তাঁহার খ্যাতি। আবার চারি বৎসর যাইতে না যাইতেই আর একজন ভারতীয়—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী—নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়া বিজ্ঞান-জগতে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করিয়া দুনিয়ার লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে শহরময় একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সকলের মুখেই এক কথা—হ্যাঁ, ডাঃ বসু ভারতীয় বটেন, তবে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকও।

এই সময় একদিন একটা মজার ব্যাপার ঘটে। প্যারিতে 'ইফেল টাওয়ার' নামে একটি প্রসিদ্ধ স্তম্ভ আছে। ডাঃ বসু ও মিসেস্ বসু উহা দেখিতে গেলেন। ডাঃ বসু বিজ্ঞান-কংগ্রেসের একজন প্রতিনিধি। কার্ড দেখাইতেই তাঁহার কোন প্রবেশমূল্য লাগিল না। কিন্তু মিসেস্ বসুকে পাঁচ ফ্রাঙ্ক (ফরাসী মুদ্রা) দর্শনী দিতে হইল। এদিকে একজন ইংরেজীভাষায় দক্ষ ফরাসী পথপ্রদর্শক (গাইড) নমস্কার করিয়া ডাঃ বসুকে জিজ্ঞাসা করিল,—Can I be of any assistance ?—আমি কি আপনার কাজে লাগ্‌তে পারি? তিনি সম্মতি জানাইয়া 'গাইড'কে নিজের কার্ড দিলেন। কিছুক্ষণ কার্ডখানার দিকে চাহিয়া থাকিয়া গাইড অবিশ্বাসের সুরে বলিল,—Bose ? Surely not Jagadish Bose? ডাঃ বসু যখন জানাইলেন,—তিনিই জগদীশ বসু, তখন 'গাইড' অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল। যখন সে জানিতে পারিল যে, মিসেস্ বসুর

নিকট হইতে পাঁচটি মুদ্রা দর্শনী বাবদ আদায় করা হইয়াছে, তখন আর যায় কোথা! Gatemanকে সে কী ভর্ৎসনা!

পরে ডাঃ বসু বার্লিন, ভিয়েনা প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞান-কেন্দ্রেও বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত যশ লাভ করিয়া তিনি তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। জগতের বৈজ্ঞানিক-মহলে ঘুরিয়া তাঁহার মন স্বদেশের দুর্দ্দশায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। শুধু তাঁহার ভাবনা হইল—কি করিয়া তাঁহার স্বদেশকে জগতের গুণিসভায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

প্যারি হইতে যখন তিনি বিলাত গেলেন, সেখানে এক বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাকে গবেষণার সুযোগ দিবার জন্য এক নূতন পদের সৃষ্টি হইল। কিন্তু যখন আহ্বান আসিল, তখন তিনি ঐ পদ গ্রহণে অস্বীকার করিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমার একার সাফল্যই যথেষ্ট নহে, আমার দেশকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া তুলিব, যেখানে দুনিয়ার লোক—

"দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে,
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।"

কিন্তু কি করিয়া সেই বিজ্ঞানমন্দির স্থাপন করা যায়? তিনি দেখিলেন, তাঁহার অর্থ নাই বটে, কিন্তু তাঁহার অপরিমিত আশা আছে, স্বদেশকে বড় করিয়া গড়িয়া তুলিবার আদর্শ আছে। তিনি নিরাশ হইলেন না, ভয়ে পশ্চাৎপদ রহিলেন না, নিজের মাহিনা হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।



গাইড্ অবিশ্বাসের স্বরে বলিল—Bose? Surely not Jagadish Bose!

১৩২৪ সনের ১৪ই অগ্রহায়ণ ভারতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। সেইদিন এই স্বদেশভক্ত বৈজ্ঞানিক "ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনায়" কলিকাতা আপার সার্কুলার রোডে 'বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে'র (Bose Institute) ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রাচীরে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে নিবেদন করিলেন—"ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য পরীক্ষার দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়েরও অতীত দুই একটি মহাসত্য আছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাসকে আশ্রয় করিতে হয়। ...শারীরেন্দ্রিয় যখন পরাস্ত হয়, তখন ধাতু-নির্ম্মিত সূক্ষ্মতর ইন্দ্রিয়ের শরণাপন্ন হই...আরও অনেক ঘটনা আছে, যাহা ইন্দ্রিয়েরও অগোচর। তাহার সম্বন্ধে কেবল বিশ্বাসবলেই জ্ঞান লাভ করা যায়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধে পরীক্ষা আছে, তাহা দুই একটি ঘটনার দ্বারা হয় না। তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার আবশ্যক। সেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই মন্দির উত্থিত হইয়া থাকে।...যদি মানুষ তাহার জীবন ও আরাধনা কোন উদ্দেশ্যে নিবেদন করে তাহা কখনও বিফল হয় না; তখন অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণ সাধুবাদ-শ্রবণ আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু যাঁহারা কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে মৃতকল্প হইয়া অদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমার কথা বিশেষভাবে তাঁহাদের জন্যই।"

"ভারতবাসীরা ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, গবেষণা-কার্য্য

কোন দিনই তাহদের জন্য নহে, এই কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। মনে হইত, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে। দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্ম্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের নহে।...যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। যদি অসীম ধৈর্য্য থাকে, কেবল তাহা হইলেই বিশ্বাস-নয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন; বারবার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই, সে-ই একদিন বিজয়ী হইবে। ...যে-সকল আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা কি একজনের জীবনের সঙ্গেই সমাপ্ত হইবে? ...জীবিত থাকিতেই হয়ত দেখিতে পাইব যে, এই মন্দিরের শূন্য অঙ্গন দেশবিদেশ হইতে সমাগত যাত্রীদের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।...আমাদের মধ্যে যে জড়তা, যে ক্ষুদ্রতা, যে ব্যর্থতা আছে, তাহাকে সংহার করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। এ সমস্ত দুর্ব্বলতার বাধা আমাদের পক্ষে কখনই চিরসত্য নহে। যে অমরত্বের অধিকারী, সে ক্ষুদ্র হইয়া থাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই....আমাদের দেশের যে মহিমা একদিন অভ্রভেদ করিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উত্থানবেগ একেবারে পরিসমাপ্তি লাভ করে নাই, পুনরায় একদিন তাহা গগন স্পর্শ করিবেই করিবে।"

"যে মুমূর্ষু, সে-ই মৃত বস্তু আগলাইয়া থাকে; যে জীবিত

তাহার জীবনের উচ্ছ্বাস চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়। আমি দেখিতে পাইতেছি যে, এই বর্ত্তমান যুগে সমস্ত ভারতের জীবনপ্রবাহে একটি করিয়া উচ্ছ্বাস ছুটিয়াছে, যাহা মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে।”

আচার্য্য আজ মৃত্যুর পরপারে বটে, কিন্তু তাঁহার চিরপোষিত বাসনা তাঁহার জীবনকালেই সত্যে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার অসংখ্য শিষ্যমণ্ডলী তাঁহারই গবেষণামন্দিরে বিজ্ঞানসাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছেন।

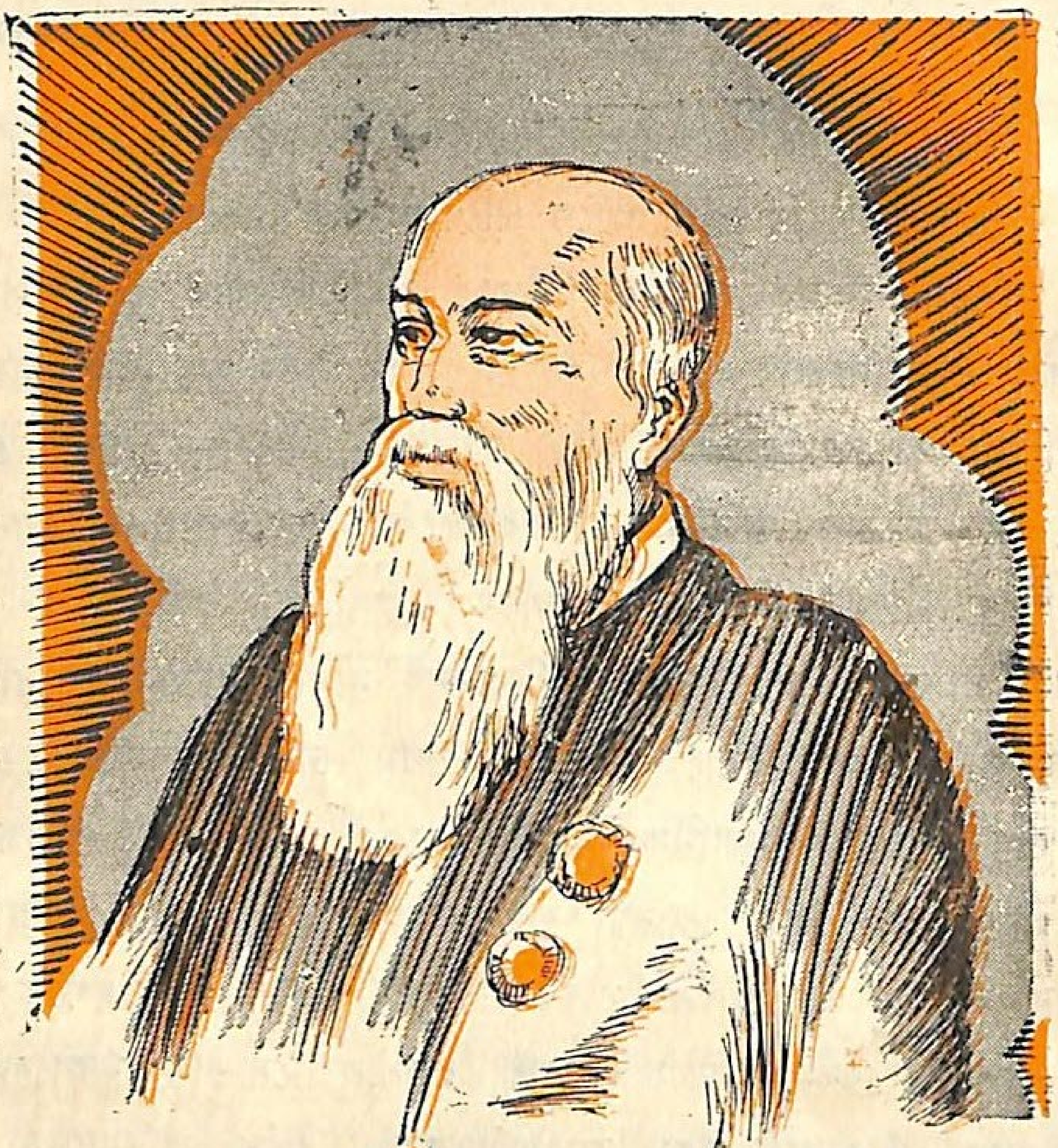
প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা সাধনাদ্বারা অনুভব করিয়াছিলেন যে, জগতের সর্ব্বত্র ঈশ্বর বিরাজ করেন—বৃক্ষে, লতায়, তৃণে, পত্রে, চন্দ্রে, সূর্য্যে, নক্ষত্রে—সর্ব্বত্রই তাঁহার অস্তিত্ব আছে। আচার্য্য বসুও প্রাচীন ঋষিদের উপযুক্ত বংশধররূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, উদ্ভিদ্-জগতের সহিত প্রাণিজগতের সাদৃশ্য আছে। উদ্ভিদ্-জগৎও প্রাণের চাঞ্চল্যে সজীব; মানুষের মত তাহাদেরও সুখদুঃখবোধ আছে। তাই কবি শ্রদ্ধা-নিবেদন করিয়াছেন—

“তোমারে হেরিয়া আজি অবিরত জাগিছে স্বপনে
সেই তপোবন-শোভা—রত সবে তপস্যাচরণে।
সে উদাত্ত সামমন্ত্র, দিব্যজ্ঞানদীপ্ত প্রভা
শান্তিসুধালিপি,
প্রতি তরু-লতা-পত্রে প্রাণ-জ্যোতিঃ
ঝলসিয়া উঠে সমুদ্ভাসি !

কণাদ জৈমিনি ব্যাস পতঞ্জলি গৌতম কপিল,—
তুমিও তাঁদেরি কেহ, প্রাণে প্রাণে অন্তরঙ্গ মিল।"

বিজ্ঞান-জগতে আচার্য্য বসুর স্থান দুনিয়ার সেই সব সেরা বৈজ্ঞানিকের সহিত, যাঁহারা নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়া পথপ্রদর্শকস্বরূপ হইয়া আছেন,—যাঁহাদের আবিষ্কৃত সত্যের আভাষ ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে নূতন পথের সন্ধান দিতেছে—যেমন নিউটন, ফ্যারাডে, কেল্‌ভিন, কুরী, আইন-ষ্টাইন বা ডারউইন। তাঁহাকে চিরদিনই নানা বাধা ও বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে—তাঁহার প্রথম চাকুরিজীবন হইতে আরম্ভ করিয়া বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচারের প্রথম যুগ পর্য্যন্ত তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া কত যে আঘাত আসিয়াছে, তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। ইহাই হইল পথপ্রদর্শকের পুরস্কার। কোন বিষয়ে অগ্রণী হইবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারাই ইহা আশীর্ব্বাদস্বরূপ লাভ করিয়াছেন। এইরূপ প্রতিকূলতায় জগদীশচন্দ্র কখনও হতাশ হন নাই। তিনি লিখিয়াছেন,—"সার্থকতাই ক্ষুদ্র এবং বিফলতাই বৃহৎ। এইরূপে যখন সফলতা ও বিফলতার মধ্যে প্রভেদ ভুলিতে শিখিলাম, তখন হইতেই আমার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইল। যদি আমার জীবনে কোন সফলতা লাভ হইয়া থাকে, তবে তাহা নিষ্ফলতার স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।"

আচার্য্যের মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী আমাদের আশাহত প্রাণকে নবীন আশায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলুক!



আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ

অনাসক্ত জ্ঞানযোগী

কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর একটি ছাত্র। মুখে তাহার প্রতিভার দীপ্তি, চোখে বিদ্যুতের ঝলক। ছাত্রটি একদিন তাহার কলেজের লজিকের অধ্যাপক হেষ্টি সাহেবের হাতে লজিকের একখানা বই দেখিল। বইখানি অত্যন্ত দুরূহ, তবো

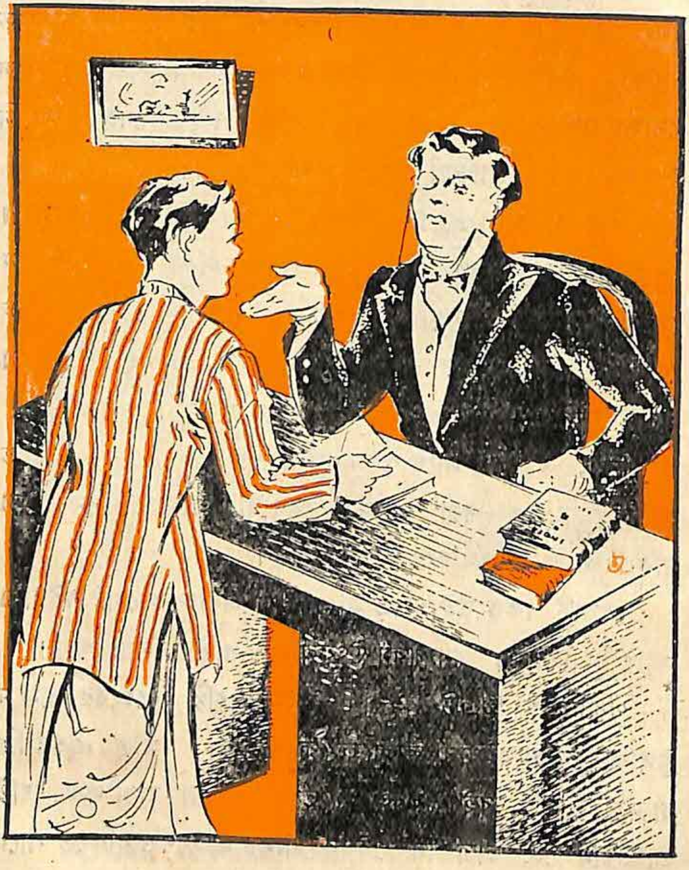
নামকরা প্রামাণ্য বই সেখানি। ছাত্রটি বইখানির নাম শুনিয়াছিল পূর্ব্বেই। কিন্তু সেদিন অধ্যাপক হেষ্টি সাহেবের হাতে বইখানি দেখিয়া সেখানি পড়িবার তাহার লোভ হইল। সে সোজা অধ্যাপক হেষ্টির কাছে উপস্থিত হইয়া সেই বইখানি চাহিল, বলিল—পড়িয়াই আমি বইটি ফেরৎ দিব।

হেষ্টি সাহেব তাঁহার ছাত্রের কথায় বিস্মিত হইলেন। ছাত্রের অনুরোধ রক্ষা করিতে অস্বীকার করিয়া তিনি বলিলেন যে, বইখানা পড়িয়া বুঝা বড় কঠিন ব্যাপার। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর কোন ছাত্রের এমন সাধ্য নাই যে, এই বইয়ের মর্ম্ম না বুঝাইয়া দিলে, সে নিজে এই বই পড়িয়া বুঝিবে।

কিন্তু ছাত্রটি নাছোড়বান্দা। সে জেদাজিদি করিতে লাগিল, বলিল—দয়া করিয়া বইখানা আমায় দিন। না বুঝিতে পারি তো অবিলম্বে ফেরৎ দিব।

ছেলেটি কিছুতেই ছাড়ে না দেখিয়া অধ্যাপক হেষ্টি বইখানা তাহাকে দিলেন। সে পরম উৎফুল্ল মনে বাড়ী চলিয়া গেল।

পরদিবসই ছাত্রটি বইখানা লইয়া হেষ্টি সাহেবের সামনে উপস্থিত হইয়া বইখানা তাঁহাকে ফেরৎ দিল। মাত্র একরাত্রি বাদেই ছাত্রটি বই ফেরৎ দিতেছে দেখিয়া অধ্যাপক হেষ্টি ভাবিলেন যে, ছাত্র নিশ্চয়ই বইখানির একবর্ণও বুঝিতে পারে নাই, তাই তাড়াতাড়ি সে উহা ফেরৎ দিতে আসিয়াছে। বই ফেরৎ পাইয়া অধ্যাপক হেষ্টি তাঁহার ছাত্রটিকে সোজা বলিলেন,—কেমন, আমি তো পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, এ



"আমি তো পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, এই বইয়ের মর্ম্ম উপলব্ধি করা তোমার মত প্রথম শ্রেণীর বালকের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ!"

বইয়ের মর্ম্ম উপলব্ধি করা তোমার মত প্রথম শ্রেণীর বালকের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ!

ছাত্রটি কিন্তু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল,—না স্যার! ইহা বুঝিতে আমার একটুও বেগ পাইতে হয় নাই। বইখানি আমি আগা-গোড়া পড়িয়াছি এবং বুঝিয়াছিও।

বালকের উত্তর শুনিয়া অধ্যাপক হেষ্টিকে বিস্মিত হইতে হইল। এই রকম একটা দুরূহ বইয়ের মর্ম্ম ছাত্রটি একরাত্রে উপলব্ধি করিয়াছে! কথাটা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাই ছাত্রটি বইখানা পড়িয়া বুঝিয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি তাহাকে উপর্য্যুপরি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

ছাত্রটিও অধ্যাপকের প্রশ্নে এতটুকু বিচলিত হইল না। প্রত্যেকটি প্রশ্নের অতি সুন্দর উত্তর সে দিল—এমন কি বইখানির ভাল-মন্দ সমালোচনা করিতেও এই তরুণ ছাত্রটি ইতস্ততঃ করিল না। অধ্যাপক হেষ্টি ইহাতে আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন এবং ছাত্রটিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর একজন নবাগত ছাত্রের পক্ষে গ্রন্থখানি বুঝিতে পারা আমি অসম্ভবই মনে করিয়াছিলাম এবং এইরূপ একখানা বই চাওয়ায় অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিয়া তোমায় তিরস্কার করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তোমার প্রতিভা অদ্ভুত। তোমার জ্ঞানালোকে সমস্ত বিশ্ব একদিন উদ্ভাসিত হইবে—এই প্রার্থনা আমি করিতেছি।"—এই কথা বলিয়া অধ্যাপক তাঁহার ছাত্রের করমর্দ্দন করিলেন।

অধ্যাপকের এই আশীর্ব্বাদ সার্থক হইয়াছিল। পরিণত বয়সে এই অসামান্য বালকের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই অসামান্য প্রতিভাবান পুরুষটিই আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে যে কয়জন চিন্তাশীল সুপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ভারতের আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁহাদের মধ্যে একজন। তাঁহার মহামনস্বিতা ও পাণ্ডিত্যের তুলনা হয় না—উহা মহাসমুদ্রের মতই অসীম। তাঁহার জ্ঞান-গরিমায় তিনি শুধু ভারতভূমিকেই নহে, সমগ্র বিশ্বকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীতে এমন খুব কম বিদ্যাই আছে যাহাতে তিনি পারদর্শিতা অর্জ্জন না করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতের আদর্শে বিশ্বাসী এই অনাসক্ত জ্ঞানযোগী জগতের সম্মুখে বাঙ্গালা তথা ভারতকে তাঁহার বিস্ময়কর মনীষার প্রভাবে যে কতদূর উচ্চে উঠাইয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার দেশবাসী আমরা আজিও হয়ত সঠিক উপলব্ধি করিতে পারি নাই। সত্য সত্যই আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্যের পরিমাপ করা, তাঁহার মহৎ গুণাবলী যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করা খুব কষ্টসাধ্য এবং সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবও নহে। প্রাচীন কালের ঋষিদের জ্ঞান-শিক্ষা ব্রজেন্দ্রনাথের ভিতর দিয়া নূতন ভাবে প্রদীপ্ত হইয়াছে।

বয়সে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা ছিলেন কয়েক বৎসরের ছোট। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, স্যার

আশুতোষ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতিও ইঁহার প্রায় সমসাময়িক। একই সময়ে বাঙ্গালার কোলে এতগুলি সুসন্তান আর বড় দেখা যায় নাই। ইঁহারাই বাঙ্গালামায়ের রত্নপ্রসূ নামকে সার্থক করিয়াছেন। ইঁহাদের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বাঙ্গালার তারুণ্য গড়িয়া উঠুক।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের পিতা মহেন্দ্রলাল শীল কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত ও ন্যায়নিষ্ঠ আইনজীবী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাধুপ্রকৃতি ছিল তাঁহার ব্যবসায়-জীবনের প্রধান অন্তরায়। কোন মোকদ্দমা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি অন্ততঃ ছয়-সাত বার বিচার করিয়া দেখিতেন, উহা নিজের যোগ্য সম্মান রক্ষা করিয়া পরিচালনা করিতে পারিবেন কি না। এমনতর লোকের কি পসার হয়? মহেন্দ্রলালের পসার হইল না। কিন্তু অর্থ-সম্পদের লালসাকে তিনি জয় করিয়াছিলেন, পার্থিব সুখ-সম্পদ ছিল তাঁহার লক্ষ্যের বাহিরে। ইহার ফলে মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে মহেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারবর্গকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়িতে হইয়াছিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহেন্দ্রলালের দ্বিতীয় পুত্র। পিতার মৃত্যুকালে ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন সাত বৎসরের বালক। পিতৃবিয়োগের পরেই তাঁহাকে তাঁহার বড় ভাইয়ের সঙ্গে মামার বাড়ী চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। তাঁহার মামার অবস্থাও খুব সচ্ছল

ছিল না। অতি কষ্টে দুই ভাই মানুষ হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাল্যকালের কাহিনী বড়ই করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী। দুঃখ মানুষকে প্রকৃত মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলে, দুঃখের অভিজ্ঞতাই জীবনে পরম সম্পদ আনিয়া দেয়, দুঃখই পরম মিত্ররূপে মানুষকে শ্রেয়ের পথে টানিয়া লইয়া যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বাল্যজীবনেই এই শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

বাল্যকালেই ব্রজেন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সময়ে ইংরেজী বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীতে ছাত্রগণকে বীজগণিত ও জ্যামিতি পড়িতে হইত। তখন গ্রীষ্মের ছুটি থাকিত মাত্র এক মাস। ব্রজেন্দ্রনাথ এই এক মাসের মধ্যে তাঁহার পাঠ্য বীজগণিত বইখানি আগাগোড়া আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। ইহার পর হইতে বিদ্যাভ্যাসে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ দেখা যাইতে লাগিল। তিনি উচ্চতর গণিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এক বৎসর যাইতে না যাইতেই তিনি এতদূর পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার স্কুলের শিক্ষককেও অনেক সময়ে অনেক দুরূহ প্রশ্নের সমাধান করিয়া বিস্মিত করিতেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত গণিতশাস্ত্রই ছিল ব্রজেন্দ্রনাথের একমাত্র প্রিয় বিষয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় জুনিয়র স্কলারশিপ পাইয়া তিনি উত্তীর্ণ হইলেন এবং জেনারেল এসেমব্লীজ ইন্‌ষ্টিটিউশনে ভর্ত্তি হইলেন। হেষ্টি সাহেবের নিকট অধ্যয়ন করিয়া সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে ব্রজেন্দ্রনাথের অত্যন্ত অনুরাগ

জন্মিল। ব্রজেন্দ্রনাথ যাহা একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিতেন, তাহা শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া তবে ছাড়িতেন। এক সময়ে তিনি যেমন গণিতশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবার সেইরূপ সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি কলেজে পড়িয়াছিলেন পাঁচ বৎসর। এমন বিষয় একটিও ছিল না, যাহা তিনি এই পাঁচ বৎসরে পড়েন নাই। ইংরেজী, ইতিহাস, ব্যবহার-শাস্ত্র, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব সমস্ত কিছুই তিনি এই অল্প দিনের মধ্যে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভাসা-ভাসা জ্ঞান তিনি পছন্দ করিতেন না—যাহা পড়িতেন ভালভাবেই পড়িতেন। তাঁহার পাঠের গভীরতা ও ব্যাপকতা কতদূর ছিল, তাহা একটিমাত্র দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে। ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়নকালে তিনি ইংলণ্ডের প্রাচীনতম সাহিত্য (চসারের পূর্ব্বেকার), এমন কি স্কটল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের পল্লীগাথাগুলি পর্য্যন্ত বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নকালে তিনি আধুনিক ও মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় দর্শন এবং ধর্ম্মতত্ত্ব পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি এত অসাধারণ ছিল যে, তিনি কখনও কিছু ভুলিতেন না। প্রত্যেক বিষয়ের খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত তাঁহার নখদর্পণে ছিল। এম্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি অর্থশাস্ত্র, সংস্কৃত, হিন্দু-দর্শন ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিলেন। বস্তুতঃ পৃথিবীতে বিদ্যা বলিতে ব্রজেন্দ্রনাথের অজ্ঞেয় কিছুই ছিল না। তিনি সময় সময় বলিতেন, প্রাকৃত-বিজ্ঞানে ও পদার্থশাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান কম।

কিন্তু তথাপি বলিতে কি, কোন কোন বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞও এই সকল বিষয়ে তাঁহার বিদ্যাবত্তায় অবাক হইয়াছেন।

এমন কোন বিষয় ছিল না, যাহাতে তাঁহার রুচির অভাব ছিল। তিনি ছিলেন সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ। এক ভদ্রলোক একদিন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া দেখিলেন, ব্রজেন্দ্রনাথ কতকগুলি ম্যাপ ও চার্ট চারিদিকে ছড়াইয়া বসিয়াছেন। তখন তিনি দক্ষিণ আমেরিকার ভূ-প্রকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্ত অধ্যয়ন করিতেছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথের মনীষা ছিল সাধারণের চেয়ে অনেক উর্দ্ধে। দুরূহ বিষয়গুলিকে তিনি আপনার করিয়া লইতেন। জটিল ও কঠিন বিষয়েই তিনি অসীম আনন্দ পাইতেন।

যাঁহারা ব্রজেন্দ্রনাথের সহিত ভালরূপে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা জানেন, কি গভীর মনোযোগ ও নিষ্ঠার সহিত তিনি অধ্যয়ন করিতেন। পৃথিবীর শত কোলাহলও ব্রজেন্দ্রনাথের তপস্যা ভাঙ্গিতে পারিত না। তিনি ছিলেন যোগীর মতই অধ্যয়নশীল—জ্ঞানের ধ্যানগম্ভীর বিরাট হিমগিরি ব্রজেন্দ্রনাথ যখনই কিছু পড়িতেন তখনই উহার দোষ-গুণ, ত্রুটি-বিচ্যুতি সকল কিছুই তাঁহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিত, কোন টীকা ভাষ্যাদির দরকার হইত না। অধ্যয়ন করিবার সময় তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেন। এমন তদ্গতচিত্ততা, তন্ময়তা খুব কমই দেখা যায়। এমন অনেক দিন গিয়াছে, তিনি হয়ত সন্ধ্যাকালে পড়িতে বসিয়াছেন এবং যখন পড়া শেষ করিয়া

উঠিয়াছেন, তখন পরদিন দুপুর বেলা। আজিকার দিনে এরূপ তপস্বী বড় দেখা যায় না।

ব্রজেন্দ্রনাথ বহুভাষাবিদ্ ছিলেন। মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া তিনি ইংরেজী, জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইতালীয়, লাটিন, গ্রীক, পারসী, আরবী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষাও বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ভারতের অনেক প্রাদেশিক ভাষাও তাঁহার জানা ছিল।

যদিও ব্রজেন্দ্রনাথ অধ্যয়নকালে বাহ্যজ্ঞানহীন দার্শনিক ছিলেন, তথাপি তাঁহার কর্ম্মশক্তির অভাব ছিল না। কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ও মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলাররূপে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। কর্ত্তব্যকার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল; অনিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে তিনি পছন্দ করিতেন না। কলেজের ছোটখাটো সকল কাজই তিনি নিজ হস্তে করিতেন; এমন কি, ছেলেদের পরীক্ষার আবেদন-পত্রে অধ্যক্ষের যাহা কিছু লিখিতে হয়, তিনি নিজেই সমস্ত লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিতেন, কেরাণীর লেখায় স্বাক্ষর করিতেন না। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার রূপে উহার উন্নতিকল্পে তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহাও তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মকুশলতার পরিচায়ক। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি মহীশূরের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের যৌবনেই তাঁহার পত্নী-বিয়োগ

ঘটে। তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যাকে স্বর্গীয় দেশবন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্তকুমার দাশের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন; কিন্তু বসন্তকুমারের অকালমৃত্যুতে তাঁহার কন্যা অল্প বয়সেই বিধবা হন। এই নিদারুণ শোক ব্রজেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ধীরভাবে সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কন্যা ও জ্যেষ্ঠপুত্র বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

১৯১১ সালে লণ্ডনে বিশ্বজাতি-সম্মেলনে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ আহূত হইয়াছিলেন এবং সেই সভায় অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া তিনি পাশ্চাত্য জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। শতবর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গঋষি রামমোহনের কণ্ঠে যেরূপ প্রাচী ও প্রতীচীর মিলনগাথা উদ্গীত হইয়াছিল, আজ আবার তাঁহারই ভাবানুজ আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ মিলন-মহোৎসবে উদ্বোধনগীতি উচ্চারণ করিলেন। বাস্তবিকই ব্রজেন্দ্রনাথের মত রামমোহনের এমন মন্ত্রশিষ্য এ যুগে আর দ্বিতীয় দেখা যায় না। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বিগত বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলনেও তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিতমণ্ডলী যাঁহাকে এরূপ সম্মান করিতেন, তাঁহার প্রতিভার পরিচয় আমরা অনেকেই জানি না। বিদেশে তাঁহার গলায় বরমাল্য অর্পিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহারই দেশবাসীর নিকট তিনি যোগ্য মর্য্যাদা এখনও লাভ করেন নাই—কারণ ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন যথার্থই অনাসক্ত জ্ঞানযোগী। সংসারের কোলাহল হইতে তিনি দূরে থাকিতে চাহিতেন, তিনি ছিলেন সত্যকারের পণ্ডিত। যশের আকাঙ্ক্ষা,

বাহ্যাড়ম্বর, সম্মান, প্রতিপত্তি, পাণ্ডিত্যাভিমান প্রভৃতি কিছুই তাঁহাকে বিচলিত বা কলুষিত করিতে পারে নাই। তিনি ছিলেন পণ্ডিত অথচ শিশুর মত সরল। তাঁহাকে স্বয়ং স্বয়ম্ভু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের প্রত্যেকেরই তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টা ও তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করা উচিত।





স্যার রাজেন্দ্রনাথ

দেশলক্ষ্মীর বরপুত্র

আগ্রার তাজমহল। শাজাহানের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি, পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের অন্যতম নিদর্শন। এই তাজমহলের সম্মুখে বারো-চৌদ্দ বৎসরের একটি বালক প্রতিদিন গিয়া বসিয়া

থাকিত, আর বসিয়া বসিয়া নির্নিমেষ নয়নে তাজের কারুকার্য্য অবলোকন করিত। ছেলেটি আগ্রার সেণ্ট্ জন্ কলেজিয়েট্ স্কুলে পড়িত। অবসর পাইলেই সে ঘরে স্থির থাকিতে পারিত না—ছুটিয়া গিয়া উপস্থিত হইত তাজমহলের পাদদেশে, তাজমহলের শিল্পনৈপুণ্য, শোভাসৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য।

তাজমহলের নির্ম্মাণ-কৌশল এই বালকের মনে এক নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিল। বালক তাজমহল দেখিতে দেখিতে ভাবিতে থাকে, সে যদি বড হইয়া এমনই একটি স্মৃতি-সৌধ গড়িতে পারিত! বালক সঙ্কল্প করিল যে, সে শিল্পী হইবে— ইঞ্জিনিয়ার হইবে—অন্ততঃ একজন রাজমিস্ত্রী হইবে।

বালকের এই আকাঙ্ক্ষা, এই স্বপ্ন মিথ্যা হয় নাই। কলিকাতার গড়ের মাঠের উপরে 'ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ'টি গড়িয়া এই কিশোর বালক তাঁহার কৈশোরের স্বপ্ন সার্থক করিয়া তুলেন। শুধু 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল' নহে, বেঙ্গল এ্যাসেম্বলি হাউস, ক্যালকাটা ক্লাব, কালীঘাটের মহীশূর স্মৃতি-ভবন, হাইজিন ইনষ্টিটিউট, চার্টার্ড ব্যাঙ্ক, হংকং ব্যাঙ্ক, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, পার্ক ম্যানসান প্রভৃতি কলিকাতার বহু সুরম্য প্রাসাদ এই বালকটিরই পরিণত প্রতিভার প্রমাণ দিতেছে। ভারতের মধ্যে শিল্প-জগতে বাঙ্গালা আজ যে জায়গাটুকু করিয়া লইয়াছে তাহার সূচনা প্রকৃতপক্ষে এই বালকটিই বড় হইয়া করিয়া-ছিলেন। এই অদ্ভুতকর্ম্মা মনীষীর নাম স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

উত্তরাধিকারসূত্রে যাহারা পিতামাতার অগাধ ধনসম্পত্তি লাভ করে, তাহাদের পক্ষে বিখ্যাত হওয়া বা প্রভূত ধনসঞ্চয় করা কঠিন নয়। কিন্তু সহায়সম্বলহীনভাবে যাঁহারা কঠোর দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিখ্যাত হন বা ধনলাভ করেন, তাঁহারা সত্যই আদর্শ মানুষ। স্যার রাজেন্দ্রনাথ ছিলেন এমনিই একজন আদর্শ পুরুষ। রাজেন্দ্রনাথের প্রথম জীবন দারিদ্র্যের কঠোরতার মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু দৃঢ় সঙ্কল্প আর অধ্যবসায়ের বলে তিনি লক্ষ্মীর বরলাভ করিয়া অগাধ ধনসম্পত্তি ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত ভ্যাবলা গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। তাঁহার মাতা উদ্যমশীলা, স্নেহময়ী ও বিদুষী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর রাজেন্দ্রনাথের মাতার উপরই তাঁহার সমস্ত দায়িত্বভার পতিত হয়। শৈশব হইতেই যে চরিত্রবল ও কর্ম্মপটুতার নিদর্শন রাজেন্দ্রনাথের জীবনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল, তাঁহার মহীয়সী মাতার অক্লান্ত চেষ্টায় ও যত্নে তাহাই তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে যশঃ, মান ও খ্যাতির সুষমায় মহিম-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরের মত রাজেন্দ্রনাথের মাতৃভক্তি ছিল অসাধারণ। মায়ের আশার্ব্বাদেই কমলা ছিলেন তাঁহার প্রতি চিরপ্রসন্না। রাজেন্দ্রনাথের মাতৃভক্তির একটি মাত্র



……প্রফুল্লমনে মাতার পদধূলি লইলেন

দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। রাজেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন আগ্রায়। শিক্ষালাভে তাঁহার একাগ্রতা ছিল এমনই প্রগাঢ় যে, কাহারও কোন কথায়ই তাঁহার মনকে সহজে টলান যাইত না। ইতিমধ্যে তিনি যখন প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, সেই সময় হঠাৎ একদিন সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার চির-আরাধ্যা মাতৃদেবী পীড়িতা। সেই সংবাদ পাইয়া তিনি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। আগ্রায় বিদ্যার্জ্জনের সকল চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন সুদূর বাঙ্গালার পল্লীকুটীরে মাতাকে স্বহস্তে সেবা করিবার প্রেরণায়। কিন্তু গৃহে ফিরিয়াই স্নেহময়ী জননীকে দরজার সম্মুখে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া রাজেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন এবং প্রফুল্ল মনে মাতার পদধূলি লইলেন। পরে জানা গেল রাজেন্দ্র-জননী এক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া পুত্রকে দেখিবার জন্য উতলা হইয়া অপরকে দিয়া নিজের গুরুতর পীড়ার কথা লিখাইয়াছিলেন; কারণ তিনি জানিতেন যে অন্য কোন অজুহাতে তাঁহাকে আনা যাইত না।

আগ্রা হইতে তিনি কলিকাতায় আসিয়া লণ্ডন মিশনারী স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং সেখান হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসে যোগদান করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিবার পূর্ব্বেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। একদিকে দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণ ও অন্যদিকে শারীরিক অসুস্থতা—এই দুইয়ের মধ্যে পড়িয়া

তাঁহাকে সেই সময় বহু কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু স্বাধীনচেতা রাজেন্দ্রনাথ দমিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি বন্ধুবর্গের চেষ্টায় অতি অল্প বেতনে একটি স্কুলে শিক্ষকতা সংগ্রহ করিয়া কোন প্রকারে দিন কাটাইতে লাগিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িবার সময় সেই বিষয়ের প্রতি তাঁহার যে গভীর অনুরাগের সৃষ্টি হইয়াছিল, স্কুল-মাষ্টারির পরিশ্রম ও অভাব-অনটনের মধ্যে তাহা লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

তখন আলিপুরের চিড়িয়াখানা নির্ম্মিত হইতেছিল। তিনি প্রায়ই সেখানে যাইয়া অসীম ধৈর্য্য ও আগ্রহ সহকারে ইঞ্জিনিয়ারগণের কার্য্য-কৌশল লক্ষ্য করিতেন। এখানেই তাঁহার সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হয়। একদিন রাজেন্দ্রনাথ চিড়িয়াখানা তৈয়ারী দেখিতে গিয়াছেন। গিয়া দেখিলেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশনের তদানীন্তত চীফ ইঞ্জিনিয়ার লেসলী সাহেব মিস্ত্রীদের আধা-হিন্দী আধা-ইংরাজিতে বাগানের ছোট একটা সেতু তৈয়ারী করিবার কৌশল বুঝাইয়া দিতেছেন। কিন্তু মিস্ত্রীরা কিছুতেই সাহেবের কথা বুঝিয়া উঠিতেছে না। রাজেন্দ্রনাথ সেইখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি সাহেবকে থামাইয়া জিনিষটা মিস্ত্রীদের বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। ফলে লেসলী সাহেব খুশী হইয়া রাজেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "তুমি একদিন পলতা ওয়াটার ওয়ার্কসে গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়ো।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজেন্দ্রনাথ সাহেবের সঙ্গে গিয়া সাক্ষাৎ

করিলেন। সাহেব সেই সেদিন চিড়িয়াখানাতেই বুঝিয়াছিলেন যে, ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাটা এই তরুণ যুবক রাজেন্দ্রনাথের বেশ ভাল রকমই জানা আছে। তাই রাজেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি সেদিন তাঁহাকে পলতা ওয়াটার ওয়ার্কসে একটি ছোটখাটো কণ্ট্রাক্টের কাজ দিলেন। কিন্তু কণ্ট্রাক্ট পাইয়া রাজেন্দ্রনাথ মহা ফাঁপরে পড়িলেন। তিনি তখন মাত্র পনের টাকা বেতনের স্কুল-মাষ্টার—অতি কষ্টে মেসের খরচ চালাইয়া টিকিয়া আছেন। কণ্ট্রাক্টের কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য যে মূলধনের দরকার তাহা তিনি পাইবেন কোথায়? কিন্তু রাজেন্দ্রনাথ দমিলেন না। তাঁহার জীবনের সঙ্কল্প—তিনি ইঞ্জিনিয়ার হইবেন—সেই সঙ্কল্প সফল হইতে চলিয়াছে। সুতরাং তিনি নিরুৎসাহ বা নিরুদ্যম না হইয়া বহুকষ্টে টাকার জোগাড় করিয়া কাজ শেষ করিয়া সাহেবকে খুশী করিলেন। স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি এই কার্য্যে এতদূর সুনাম অর্জ্জন করিলেন যে, টি. সি. মুখার্জ্জি এণ্ড কোম্পানীর ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় নামে জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার কারবারের অংশীদার করিয়া লইলেন

আগ্রায় জলের কল বসাইবার পরিকল্পনার কণ্ট্রাক্ট লইতে গিয়া রাজেন্দ্রনাথ একবার মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন। শ্বেতাঙ্গ কণ্ট্রাক্টরদের পক্ষপাতিত্বের জন্য তিনি ঐ কার্য্যে সফলকাম হইতে পারেন নাই। পরে তিনি ওয়ালস্ লোভেট এণ্ড কোম্পানী নামক এক বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত একত্রিত

হইয়া কিছুদিন কার্য্য করেন। কিন্তু একজন বাঙ্গালীর এই প্রকার প্রতিভা বিদেশীয়দের বরদাস্ত হইল না। কাজেই ঐ প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ তাঁহার সহিত অসঙ্গত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ঐ কোম্পানীর অংশীদারগণের মধ্যে একজন বড় অংশীদার মিঃ টমাস একুইন মার্টিন রাজেন্দ্রনাথের কর্ম্মকুশলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং ঐ কোম্পানীর সহিত সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া রাজেন্দ্রনাথকে অংশীদাররূপে গ্রহণ করিয়া মার্টিন কোম্পানী নামে এক নূতন কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজেন্দ্রনাথের একাগ্রতা ও সহযোগিতার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই মার্টিন কোম্পানী অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিল এবং ধীরে ধীরে রাজেন্দ্রনাথই ঐ কোম্পানীর সর্ব্বপ্রধান অংশীদার এবং সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন।

রাজেন্দ্রনাথ যে অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁহার মানসিক শক্তি যে অত্যন্ত প্রবল ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার বার্ণ এণ্ড কোম্পানীর সর্ব্বময় প্রভুত্ব-লাভের প্রচেষ্টায়। কলিকাতা কর্পোরেশনের ড্রেন নির্ম্মাণের ব্যাপার লইয়া তাঁহার সহিত একদা বার্ণ এণ্ড কোম্পানীর জনৈক শ্বেতাঙ্গ ইঞ্জিনিয়ারের সংঘর্ষ হয়। সেই দিনই তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, একদিন ইহার উপযুক্ত উত্তর দান করিতে হইবে। ১৯২৭ সালে বার্ণ কোম্পানী সম্পূর্ণরূপে ক্রয় করিয়া তিনি তাঁহার ঐ প্রতিজ্ঞা পালন করেন।

কিন্তু রাজেন্দ্রনাথের কর্ম্মশক্তি কেবলমাত্র ব্যবসায়-ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৯১০ সালে তিনি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমিশনের সভাপতি পদে মনোনীত হন। তাহার পরবৎসরই তিনি কলিকাতার শেরিফ হইবার সম্মান লাভ করেন। তিনি ১৯০১ সালে সি. আই. ই., ১৯১১ সালে কে. সি. আই. ই. এবং ১৯২২ সালে কে. সি. ভি. ও. উপাধি প্রাপ্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে সম্মানাত্মক ডি. এস-সি. উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। হাওড়া ব্রীজ কমিটির প্রেসিডেণ্ট, ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কমিটির সদস্য, ইণ্ডিয়ান কোল কমিটির সদস্য, ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের গভর্ণর প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি বিভিন্ন দিকে তাঁহার অসামান্য কর্ম্ম-শক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

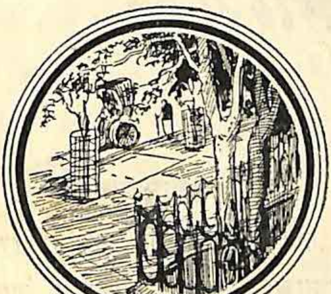
রাজেন্দ্রনাথ একজন উদারচেতা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কোন প্রকার গোঁড়ামিই তিনি পছন্দ করিতেন না। যে ধর্ম্মের যাহা কিছু শুভ তাহাই গ্রহণ করিয়া অশুভ সবকিছু বর্জ্জন করা তাঁহার চিরকালের স্বভাব ছিল। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। কর্ম্মকেই রাজেন্দ্রনাথ জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্ম্মকেই তিনি ধর্ম্ম বলিয়া মানিতেন। তাঁহার কর্ম্মস্পৃহা, চরিত্রবল, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সময়ের মূল্যজ্ঞান সকলেরই আদর্শ হওয়া উচিত।

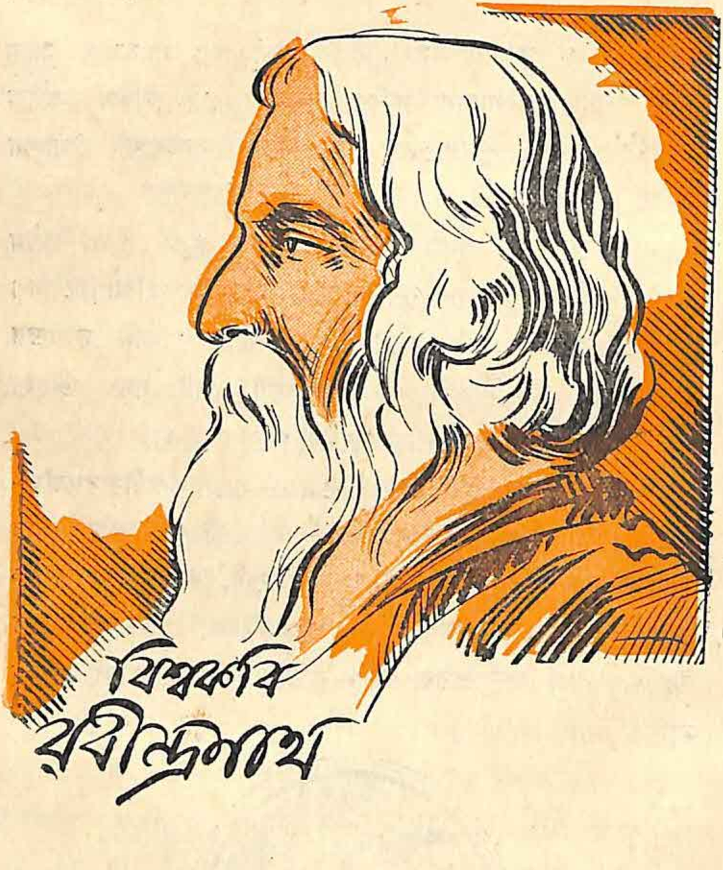
রাজেন্দ্রনাথ যদিও কোন দিনই রাজনীতিজ্ঞ হইতে চান

নাই তথাপি তাঁহার সমসাময়িক রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে তিনি যথাসম্ভব সাহায্য করিয়াছিলেন। গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব তিনিই সর্ব্বপ্রথম উত্থাপন করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে অর্থাভাব খুবই ছিল, তখন তিনি দারিদ্র্যের জ্বালা পূর্ণমাত্রাতেই অনুভব করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া তিনি দরিদ্রের দুঃখমোচনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার দানশীলতার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১৯৩৬ সালে কর্ম্মবীর রাজেন্দ্র-নাথের গৌরবময় জীবনের অবসান ঘটিয়াছে। বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান, প্রতিভার বরপুত্র, নিরহঙ্কার, মাতৃভক্ত ও দানশীল রাজেন্দ্রনাথের স্মৃতি যে বাঙ্গালী জাতিকে যুগে যুগে উন্নতির পথে অনুপ্রেরণা প্রদান করিবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।





জগৎ-পূজ্য মহামানব

ছোট্ট একটি ছেলে। ছেলেটি একদিন দেখিল যে, তাহার দাদা আর বয়োজ্যেষ্ঠ এক ভাগিনেয় স্কুলে ভর্ত্তি হইতে যাইতেছেন। উহাদিগকে স্কুলে যাইতে দেখিয়া বালকের বড়

সখ হইল যে সেও স্কুলে যায়। ইহার পূর্ব্বে ছেলেটি কখনও গাড়ী চড়ে নাই বা বাড়ীর বাহির হয় নাই। সেইজন্য যখন সে দেখিল যে, তাহার দাদা আর ভাগিনেয়টি গাড়ী চড়িয়া স্কুলে যাইবার আয়োজন করিতেছেন, তখন সে বায়না ধরিল যে, সেও স্কুলে যাইবে। কিন্তু সে যে তখনও নিতান্ত ছেলেমানুষ! তাই তাহার কান্না, তাহার আবদার—কিছুতেই কিছু হইল না। সে বাড়ীতে পড়িয়া রহিল। তাহার দাদা আর ভাগিনেয়টি স্কুলে গেলেন।

ছেলেটির দাদা আর ভাগিনেয় রোজই স্কুলে যান, আর স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা এমন করিয়া কলিকাতার রাস্তার কথা, স্কুলের কথা ফলাও করিয়া ছেলেটির কাছে বলিতে থাকেন যে, তাহা শুনিয়া ছেলেটির মন আর কিছুতেই ঘরে টিকিতে চাহিত না। সে রোজ তাহার দাদা আর ভাগিনেয়ের স্কুল-যাওয়ার গল্প শুনিত, আর স্কুলে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

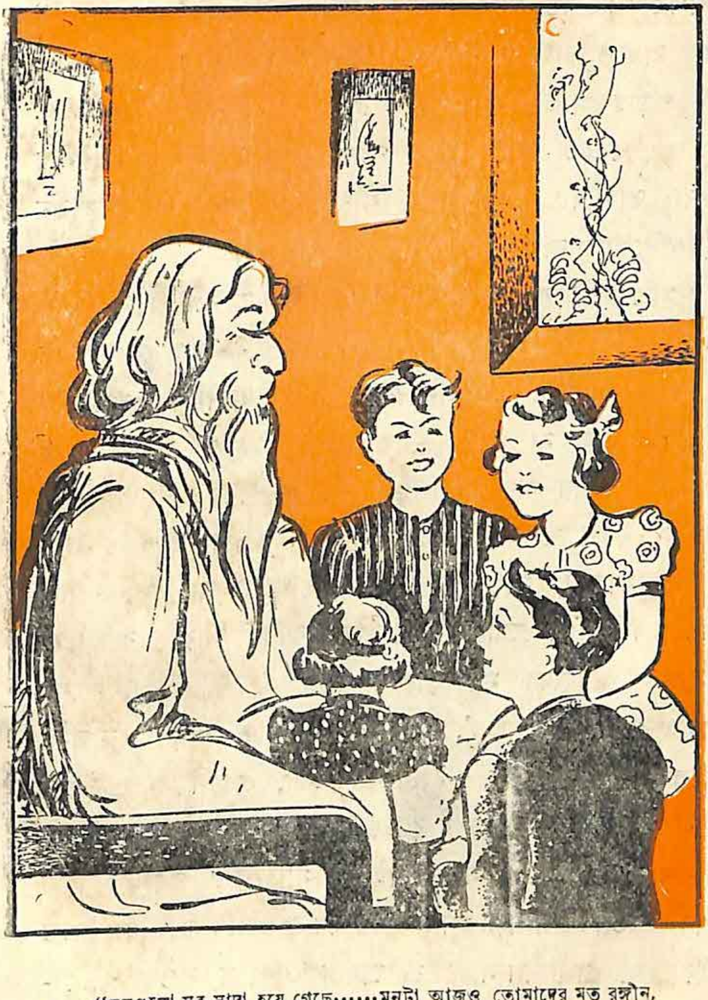
স্কুলে ভর্ত্তি হইবার জন্য ছেলেটিকে এমনি ব্যাকুল দেখিয়া ছেলেটির গৃহশিক্ষক একদিন ছেলেটিকে বলিলেন, "এখন স্কুলে যাইবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, স্কুলে ভর্ত্তি হইলে স্কুলে না-যাইবার জন্য উহার চেয়ে আরও অনেক বেশী কাঁদিবে।"

মাষ্টার মহাশয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হইয়াছিল—একদিন এই ছেলে স্কুলে ভর্ত্তি হইবার জন্য কাঁদিয়াছিল, কিন্তু স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া এই ছেলেই স্কুলে না যাইবার জন্য অনেক

বেশী কাঁদিয়াছিল। ইহার কারণ লেখাপড়ার প্রতি ছেলেটির বিরাগ নহে। ইহার কারণ—বিদ্যালয়-জীবন ছেলেটির কাছে দুঃসহ বলিয়া বোধ হইত। বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা নিয়মকানুন, সেখানকার কঠোর শাসনপ্রণালী—পড়া না বলিতে পারিলে শাস্তি প্রভৃতি দেখিয়া ছেলেটির মন বিদ্যালয়ের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। স্কুলের ঘরগুলা তাহার কাছে নির্ম্মম বলিয়া বোধ হইত, উহার দেওয়ালগুলা পাহারাওয়ালার মত মনে হইত।

এই যে বালক—ইনিই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৬১ সালের ৭ই মে (বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ) কলিকাতার জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ঠাকুরপরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতামহ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র।

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িতে পারিতেন না, স্কুলে পড়িতেও তাঁহার ভাল লাগিত না। কলিকাতার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে, নর্ম্মাল স্কুলে, বেঙ্গল একাডেমি নামে এক ফিরিঙ্গি স্কুলে আর বিলাতের ব্রাইটন শহরের একটি স্কুলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্য ও কৈশোরে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতাকামী কবির মন কোন বিদ্যালয়েই টিকিত না। যে কয়টি বিদ্যালয়ে তিনি পড়িয়াছিলেন তাহার প্রত্যেকটিকে তাঁহার মনে হইত যেন এক-একটি



......"চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে......মনটা আজও তোমাদের মত রঙ্গীন,
আজও আমি তোমাদেরই মতো তরুণ"।

খোপওয়ালা বড় বাক্স। তাই স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া রবীন্দ্রনাথ স্কুলে যাইতে চাহিতেন না—তিনি স্কুল পালাইতেন।

পড়ার প্রতি যাহাতে দেশের ছেলেদের মনে ভয় জন্মাইয়া না যায়, সেজন্য রবীন্দ্রনাথ পরবর্ত্তীকালে মুক্ত আবেষ্টনীর মধ্যে তাহাদের লেখাপড়া শিখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন শান্তিনিকেতন নামক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া।

মুক্তিকামী বালক কবি স্কুল পালাইতেন বটে, এবং তিনি স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শিখেন নাই বটে,—কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনদিনও এতটুকু উদাসীনতা দেখা যায় নাই। স্কুলে না পড়িয়া—কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় আর পিতার শিক্ষায় বাড়ীতে পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ যে রকম পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প-বয়সেই ফারশী, সংস্কৃত ও ইংরেজী শিখিয়াছিলেন এবং বালক বয়সেই তিনি পারস্যের কবি হাফিজের কবিতা আবৃত্তি করিতেন, সংস্কৃত উপনিষদের মন্ত্র আবৃত্তি করিতেন, কবি কালিদাসের সংস্কৃত গ্রন্থ 'কুমারসম্ভব', 'শকুন্তলা' প্রভৃতি পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, ইংরেজ কবি ও নাট্যকার শেলী, সেক্সপীয়ার প্রভৃতির কাব্য ও নাটক পড়িয়া শেষ করিয়াছিলেন। আর বাঙ্গালা বইয়ের ত কথাই নাই। সে সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের কলেবর ছিল ক্ষীণ। তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের যে কয়খানি বই প্রকাশিত হইয়াছিল, প্রায় সে সবই রবীন্দ্রনাথ একরূপ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদনের কাব্য-নাটক, দীনবন্ধু মিত্রের নাটক

আর বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন—কিছুই আর কবির পড়িতে বাকী ছিল না। এ সম্বন্ধে কবি নিজেই বলিয়াছেন, "আমার বাল্যকালে বাঙ্গালা সাহিত্যের কলেবর কৃশ ছিল। বোধ করি পাঠ্য অপাঠ্য বাঙ্গালা বই যে কয়টা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম"।

ছেলেবেলাতেই রবীন্দ্রনাথ এমন সব বই পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, যাহার নাম পর্য্যন্ত তাঁহার ক্লাসের ছেলেরা বা তাঁহার সমবয়সী ছেলেরা জানিত না। কাজেই স্কুলে পড়াশুনা না করিলেও তাঁহার জ্ঞান ও বিদ্যা বড় কম হয় নাই। যে বয়সে ছেলেরা সাধারণতঃ ইংরেজি প্রাইমার পড়ে এবং সামান্য যোগবিয়োগের অঙ্ক কষিয়া থাকে, সেই বয়সে তিনি পড়িতেন সেক্সপীয়রের নাটক, শেলীর কাব্য, সংস্কৃত কাব্য, নাটক, ব্যাকরণ, জ্যামিতি ও বিজ্ঞান।

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ শুধু পাঠ মুখস্থই করেন নাই; তাঁহার যখন পাঁচ বৎসর বয়স সেই সময় হইতেই তিনি আবৃত্তিও অভ্যাস করিতেন। রামায়ণ-মহাভারতই তখন তিনি বেশী করিয়া আবৃত্তি করিতেন। ছেলেবেলাতে এইরূপ আবৃত্তি অনুশীলন করিতে শুরু করায় উত্তরকালে তিনি একজন বিশ্ব-বিখ্যাত আবৃত্তি-কারক হিসাবে পরিচিত হন। যে কেহ এবং যে কোন দেশের লোক তাঁহার আবৃত্তি শুনিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। গান আর ছবি আঁকার প্রতিও ছেলেবেলাতেই কবির আসক্তি জন্মে। একবার পিতাকে একটি গান শুনাইয়া তিনি এত মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতা মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ খুশী হইয়া তাঁহাকে একটি পাঁচশত টাকার চেক দিয়াছিলেন। আবৃত্তির মত সঙ্গীতেও তাঁহার কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা ছিল অবর্ণনীয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্যকালেই কবিতা রচনা করিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন তের-চৌদ্দ হইবে সেই সময়েই তিনি অজস্র কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। আর শুধু রচনা করা নয়, সেই সকল কবিতা রচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সব মাসিক পত্রিকায় সেগুলি প্রকাশিত হইতে থাকে। কবির যখন যোল বছর বয়স—অর্থাৎ যে বয়সে ছেলেরা সাধারণতঃ প্রবেশিকা পরীক্ষার গণ্ডি সবেমাত্র পার হয়—সেই বয়সে রবীন্দ্রনাথের বহু খণ্ড-কবিতা, তিন চারখানি কাব্য আর অনেকগুলি চমৎকার চমৎকার গদ্য-রচনা প্রকাশিত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার প্রথম কাব্য 'বনফুল', প্রথম উপন্যাস 'ঝরণা', 'ভিখারিণী' নামক বড় গল্প, আর 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'—এ সবই রবীন্দ্রনাথ কৈশোরের প্রান্তে উপনীত হইবার আগেই রচনা করিয়াছিলেন।

বালক রবীন্দ্রনাথকে প্রথম কবিতা লিখিতে শিখান তাঁহার এক ভাগিনেয়। ইনি কবির চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন,—ইঁহার নাম জ্যোতিঃপ্রকাশ। জ্যোতিঃপ্রকাশের কাছে কবিতা রচনার প্রথম পাঠ শিখিয়া রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং নূতন কবিতা লিখিতে শিখিয়া যখনই তিনি হাতের কাছে কাগজের টুকরা পাইতেন তখনই

কবিতা রচনা করিয়া কাগজখানিকে ভরিয়া ফেলিতেন। ইহার পর বাড়ীর এক কর্ম্মচারীর কাছ হইতে একখানা নীল কাগজের খাতা চাহিয়া লইয়া উহাতে বহু কবিতা রচনা করিয়া তিনি খাতাখানি ভরিয়া ফেলিলেন।

সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ—বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার দানে কত যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহার পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

সাহিত্যে অনন্যসাধারণ প্রতিভার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথকে 'সাহিত্যাচার্য্য' (ডি. লিট্) এই সম্মানজনক উপাধি দিয়াছিলেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহাকে উক্ত উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ইউরোপে যুদ্ধ চলিতে থাকায় এবং রবীন্দ্রনাথও অসুস্থ থাকায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণকে বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতনে আসিয়া এই উপাধি প্রদান করিতে হইয়াছে। তাঁহার অতুলনীয় কাব্য-প্রতিভার জন্য "কবীন্দ্র" ও "কবিগুরু" আখ্যাতেও তিনি সচরাচর পরিচিত হইতেন।

রবীন্দ্রনাথ বড়লোকের ছেলে ছিলেন—কলিকাতার বিখ্যাত ধনী পরিবার ঠাকুরবাড়ীতে তাঁহার জন্ম হয়। কিন্তু বড়লোকের ছেলে হইলে কি হইবে, বাল্যকালে বড়লোকের ছেলের মত আদর-যত্ন তিনি কোন দিনও পান নাই। এমন কি, ভাল জামা-কাপড় পর্য্যন্ত তিনি পরিতে পাইতেন না।

বলিতে গেলে চাকর-বাকরই ছিল তাঁহার অভিভাবক। সামান্য ত্রুটির জন্য তাঁহাকে চাকরের হাতে মার পর্য্যন্ত খাইতে হইয়াছে। সেইজন্য তিনি বাল্যে বিলাসিতা শিখিবার অবসর পান নাই কিংবা পরবর্ত্তী জীবনে কখনও অন্যায় বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেন নাই। অহেতুক সখ তিনি কোন দিনই পছন্দ করিতেন না। একবার তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহার স্ত্রী সখ করিয়া তাঁহাকে একটি সোনার আংটি দিয়াছিলেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ খুশী তো হইলেনই না, বরং স্ত্রীকে এজন্য ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। পুরুষমানুষ সোনার গহনা পরিবে, ইহা ছিল তাঁহার সংস্কারের বাহিরে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু একজন সুবিখ্যাত কবিই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও সমালোচক। বর্ত্তমান যুগে তাঁহার মত সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা আর দেখা যায় না। এমন কি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, চিকিৎসা-বিদ্যায়ও তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল ; তিনি ভাল বাইওকেমিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে পারিতেন। তিনি যে বিষয়েই কলম ধরিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি বহু গদ্য ও পদ্য লিখিয়া অতুলনীয় যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন। এখানে তাঁহার সমস্ত বইয়ের তালিকা দেওয়া অসম্ভব। 'গীতাঞ্জলি' তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। এই কাব্যের জন্যই তিনি পৃথিবী-বিখ্যাত নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই

নবেম্বর সুইডিস একাডেমী তাঁহাকে সাহিত্যের জন্য এই পুরস্কার দেন। সমগ্র এশিয়া মহাদেশে রবীন্দ্রনাথই প্রতিভার এই সর্ব্বোচ্চ সম্মান সর্ব্বপ্রথম লাভ করেন। তাঁহার পর আর একজন ভারতবাসীর এই সম্মান-লাভের সৌভাগ্য হইয়াছে। তিনি স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন। পদার্থ-বিদ্যায় তিনি নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ৮১ বৎসর বয়সে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন, কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন খাঁটি তরুণ, তাঁহার যৌবন ছিল যেন চির-অচঞ্চল। তাঁহার প্রতি কার্য্যে, কল্পনায়, হাস্য-পরিহাসে, কথা-বার্ত্তায় সর্ব্বত্রই তারুণ্যের উচ্ছ্বাস। বাঙ্গালীর জীবনে এটা যেন স্বপ্ন, একটা বিরাট বিস্ময়। শেষ জীবনে একদিন রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে গল্পপ্রসঙ্গে উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে, ভয় পেয়োনা তাই বলে। মনটা আজও তোমাদের মতোই রঙিন, আজও আমি তোমাদেরই মতো তরুণ।" রবীন্দ্রনাথ ছোটদের খুব ভালবাসিতেন। তাহাদের জন্য তিনি অনেক গল্প ও কবিতা লিখিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের যশঃসৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে পৃথিবীর নানা দেশ হইতে তাঁহার আমন্ত্রণ হইতে থাকে। তিনি ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, জাপান, যাভা, পারস্য প্রভৃতি বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই অশেষ সম্মান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার

ভ্রমণ-কাহিনীগুলি অনবদ্য ও জ্ঞানসম্ভারে সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে বা পরে ভারতবর্ষে এইরূপ ভ্রমণ-কাহিনী আর কেহ লিখিতে সক্ষম হন নাই।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রেমেরও তুলনা হয় না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর লর্ড কার্জ্জন বাঙ্গলাদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। ইহার প্রতিবাদে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনে প্রবলবেগে ঝাঁপাইয়া পড়েন। ঐ দিনটিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য তিনি রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জালিয়ান-ওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পর তিনি সরকার-প্রদত্ত "স্যার" উপাধি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে রবীন্দ্র-জীবনীর বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব। তাঁহার জীবনের এক-একটি দিক লইয়া এক একটি বিরাট গ্রন্থ হইতে পারে। ১৩৪৭ সনের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ একাশী বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন। দেশের ও বিদেশের বহু মনীষী এই উপলক্ষে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছিলেন,—"আপনার জীবনের চার কুড়ি বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। পাঁচ কুড়ি বৎসর ধরিয়া জীবিত থাকুন, এই প্রার্থনা।" উত্তরে রবীন্দ্রনাথ জানাইলেন, "চার কুড়ি বছর বেঁচে থেকে যথেষ্ট বেয়াদপি করেছি, পাঁচ কুড়ি বাঁচলে সেটা অসহ্য হয়ে উঠবে।"

রবীন্দ্রনাথের এই পরিহাস যে খুব শীঘ্রই সত্য হইবে কেহ

তাহা ভাবিতেও পারে নাই। আষাঢ় মাসের শেষভাগে তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া একটা অস্ত্রোপচার করা হইল, কিন্তু রোগ সারিল না। ১৩৪৮ সনের ২২শে শ্রাবণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার শবযাত্রায় কলিকাতা শহরের আবালবৃদ্ধবনিতা যেরূপ দলে দলে যোগ দিয়াছিল, তাহাতেই বোঝা যায় জাতির তিনি কতখানি আপন ছিলেন। সর্ব্বভারতীয় মনীষীরা তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। বিলাতেও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্যোগে শোক-সভা হইয়াছে।

বোলপুরের 'শান্তিনিকেতন' এবং 'বিশ্বভারতী' রবীন্দ্রনাথের বিরাট কীর্ত্তি। প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি 'শান্তিনিকেতন' প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথিবীর নানাদেশ হইতে আগত পণ্ডিতগণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। আমাদের কর্ত্তব্য, কবির এই শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিকে আপ্রাণ সাধনায় বাঁচাইয়া রাখা।



আদর্শ শিক্ষাগুরু

বহুদিন আগের কথা। কলিকাতায় এক বিরাট সভা হইবে। কাগজে কাগজে ঘোষণা করা হইয়াছে,—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

ঠিক ছয়টায় সভা বসিবার কথা। পনর মিনিট বা আধ

ঘণ্টা দেরী হইলেও বিশেষ আসিবে যাইবে না ; কেননা ঘোষিত সময়ে সভা সাধারণতঃ হয় না, ইহাই লোকের ধারণা। আমাদেরও সেই ধারণাই ছিল।

কিন্তু এ কী! ছয়টা পনের মিনিটে সভাস্থলে গিয়া দেখি, লোকে লোকারণ্য ; তিলধারণের স্থান নাই। বহু কষ্টে ভিড়ের ভিতর একটু স্থান করিয়া লইলাম।

এত পরিশ্রমও বুঝি বৃথা হইল! মঞ্চের দিকে চাহিয়া সভাপতিকে খুজিতে লাগিলাম, কিন্তু তিনি কই? হতাশ হইয়া পাশের এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মশাই, পি. সি. রায় কোথায়? তিনি কি আসেন নি?"

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে কোন উত্তর না দিয়া বিরক্তভাবে মুখখানা ঘুরাইয়া লইয়া আবার বক্তার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কিঞ্চিৎ অধৈর্য্য হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"পি. সি. রায় কি এখনও আসেন নি?" এবারে ভদ্রলোক নিতান্ত বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন,—"মশাই, কলকাতায় নতুন এসেছেন নাকি?"

ভদ্রলোকের মেজাজ দেখিয়া আমিও গরম হইয়া উঠিলাম। অবস্থা রীতিমত গুরুতর বুঝিয়া উপস্থিত অন্যান্য লোকজন আমাদের দিকে নজর দিলেন। আমাদের উভয়ের কথা শুনিয়া তাঁহাদেরই একজন হাসিয়া বলিলেন,—"ওঃ বুঝ্‌তে পেরেছি।" আমাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন,—"আপনি



আপনি কখনও পি. সি. রায়কে দেখেন নি, না ?...

কখনও পি. সি. রায়কে দেখেন নি, না? তবে আসুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।” মঞ্চের দিকে অঙ্গুলি দিয়া তিনি দেখাইয়া দিলেন, রুগ্ন, কঙ্কালসার, খর্ব্বাকৃতি, ফ্রেঞ্চকাট দাড়িযুক্ত, উস্কখুস্ক-চুল-বিশিষ্ট, খদ্দরের কোট ও ধুতি পরিহিত এক সাধারণ বৃদ্ধকে। বিশেষ মনোযোগ দিয়া দেখিয়া লইয়া ভদ্রলোকের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আবার চাহিলাম। ভাবটা যেন এই,—“এ লোক কি পি. সি. রায় হতে পারে? তিনি হবেন বিরাট পুরুষ,—যাঁর দিকে চাইলে মাথা আপনিই নত হ’য়ে আসে।”

ভদ্রলোক আমার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। হাসিয়া বলিলেন,—“শোনেন নি, যে সভায় পি. সি. রায় সভাপতি,— সে সভায় তিনি এক মিনিটও দেরীতে আসেন না?” এতক্ষণে যেন একটু বিশ্বাস হইল। শুনিয়াছিলাম, আচার্য্য রায়ের মত সময়নিষ্ঠ পুরুষ বাঙ্গালায় দুইজন নাই। যাঁহার অতি সাধারণ চেহারা দেখিয়া বিশ্বাস করিতে পারি নাই যে তিনিই প্রফুল্লচন্দ্র, তাঁহার সময়নিষ্ঠার কথা মনে পড়িতেই তিনি যে প্রফুল্লচন্দ্র, তাহা তো বিশ্বাস করিলামই, অধিকন্তু লজ্জা আসিয়া আমার সারা মন ছাইয়া ফেলিল। আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম।

বক্তার পর বক্তা বক্তৃতা দিয়া চলিলেন, কিন্তু কাহারও কথা আমার কানে পৌঁছিল না। আমি শুধু একদৃষ্টিতে শ্রদ্ধার সহিত ঐ পলিতকেশ ভঙ্গুরদেহ জরাজীর্ণ বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া রহিলাম। একের পর এক কত কথাই না মনে পড়িতে

লাগিল। ইঁহার আশ্চর্য্য জীবনকাহিনী পড়িয়া যে মূর্ত্তি মনে মনে গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, তাহা বাস্তবের সহিত খাপ খাইল না বটে, কিন্তু আমার শ্রদ্ধা আরও শতগুণ বাড়িয়া উঠিল। এই ভঙ্গুর দেহ লইয়া কী করিয়া তিনি অসাধ্য সাধন করিলেন? মনে পড়িল, বাঙ্গালার ব্যবসা-বাণিজ্য গড়িয়া তুলিবার জন্য তাঁহার আপ্রাণ প্রচেষ্টা, ভারতবর্ষকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পৃথিবীর অন্য দেশের সমকক্ষ করিবার সাধনা, বাঙ্গালী ছেলেকে মানুষ করিবার জন্য, অন্নহীন বাঙ্গালীর মুখে অন্ন তুলিয়া ধরিবার জন্য একক সংগ্রাম। মনে মনে যুক্তকরে আচার্য্যদেবের উদ্দেশ্যে নমস্কার করিলাম।

সকলের শেষে আচার্য্যদেব দাঁড়াইলেন। সভাস্থলে অবিরাম হাততালি পড়িতে লাগিল। আর যাইবে কোথা! হাত নাড়িয়া নাড়িয়া তিনি বাঙ্গালী জাতির অন্তঃসারশূন্যতার জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, রূঢ় গালি শুনিয়াও যেন সকলে কৃতার্থ হইয়া গেল। আচার্য্য রায় পরিষ্কার বাঙ্গালায় অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতির উদ্ধারের উপায় বর্ণনা করিয়া তাঁহার ভাষণ শেষ করিলেন এবং বক্তৃতার উপসংহারে বজ্রনির্ঘোষে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সকলে প্রতিজ্ঞা কর—জাতিকে বড় করিয়া তুলিবে। তোমরা পারিবে কি? তোমাদের সাধনা দিয়া জাতিকে সমৃদ্ধ করিতে পারিবে কি?" সভার এক দিক হইতে অন্য দিকে এই একই কথা বার বার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

সেদিন ভাবিতে ভাবিতে সভা হইতে ফিরিয়া আসিলাম।

বহুদিন আগে সেই যে একদিন তাঁহার বাণী শুনিয়াছিলাম, তাহা আজিও থাকিয়া থাকিয়া মনে হয়—"তোমাদের সাধনা দিয়া জাতিকে সমৃদ্ধ করিতে পারিবে কি ?"

সুক্ষণে পিতামাতা নাম রাখিয়াছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র—এমন অমায়িক, শিশুর মত সরলপ্রাণ ও আনন্দময় পুরুষ বাঙ্গালায় নাই বলিলেই চলে। তাঁহার মত একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের এমন সরল ব্যবহার ও খোলা মন দেখিলে কে না আশ্চর্য্য হয় !

যাঁহারা জীবনে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের ছোটকালের ইতিহাস সাধারণতঃ একটু বৈচিত্র্যময়। সাধারণ ছেলেমেয়ে হইতে তাঁহাদের একটা কিছু বিশেষ ঝোঁক থাকে! সেই সেই ঝোঁককে যদি অনুকূল অবস্থায় চালনা করিতে পারা যায়, তবে তাহা পরবর্ত্তী জীবনে অত্যন্ত সুফল দেয়—বিদ্যা, ধন, যশোলাভে সহায়তা করে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছোটকালে একটি বিশেষ ঝোঁক ছিল—তাহা জ্ঞান-অর্জ্জনের ঝোঁক। বিশেষ করিয়া তাঁহার ঝোঁক ছিল ইতিহাসের দিকে।

খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামে ১২৬৮ সালে প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা হরিশচন্দ্র স্বীয় পুত্রগণকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও সকল সময়েই নিজেকে ছাত্র বলিয়া মনে করিতেন। পিতার আদর্শ পুত্রের মনে গভীর রেখাপাত

করিয়াছিল। আচার্য্যদেব সেদিনও বলিয়াছিলেন,—"আমি এখনও নিজেকে ছাত্র মনে করি। সে জীবন ত্যাগ ক'রে একদিনও অন্য জীবনে পদার্পণ ক'রেছি বলে মনে হয় না। জ্ঞানের অনুশীলন আমি ক'রে থাকি। আমি আজীবন ছাত্রভাবেই আছি। আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন কখন চলে গেছে, বুঝ্‌তে পারিনি ; আজ বার্দ্ধক্যে পা দিয়েও আমি সেই ছাত্রই আছি। আমি দিনের মধ্যে দু'ঘণ্টা নিভৃতে ভাল পুস্তক সঙ্গী ক'রে কাটিয়ে দিই—দিন সার্থক হয়। জগতে যা কিছু সৎ চিন্তা, উৎকৃষ্ট ভাব আছে, যা কিছু উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং মানুষ হবার প্রেরণা দেয়, সবই পুস্তকে নিহিত।"

কিশোর প্রফুল্লচন্দ্রের মনের 'ঝোঁক' পিতার সুশিক্ষার গুণে সুনিয়ন্ত্রিত হয় ; ইহা পরবর্ত্তী জীবনে আচার্য্য রায়ের সাফল্যলাভের একটি কারণ। তিনি এতদূর জ্ঞানপিপাসু হইয়া উঠিলেন যে, অতিরিক্ত পাঠে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিশোর বয়সে সেই যে স্বাস্থ্য নষ্ট হইল, তাহা জীবনে কোন দিনই উদ্ধার হইল না। কিন্তু তাহাতেও তিনি নিরাশ হন নাই—অসুখের সময়ও তিনি জ্ঞানলাভে নিশ্চেষ্ট হইতেন না।

আচার্য্যদেবের জীবনে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। তাঁহার বরাবরই ইচ্ছা ছিল, তিনি ঐতিহাসিক হইবেন। কিন্তু শেষে একদিন ভাবিলেন—"আমি বিদ্যাসমুদ্রের শেষসীমায় যাচ্ছি ; আর আমি বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জান্‌ব না ?" তখন তাঁহার মনে বৈজ্ঞানিক হইবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। জীবনব্যাপী

কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হইলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন,—"I am a chemist by mistake—আমি ভুল করিয়া রাসায়নিক হইয়াছি।" কিন্তু বৈজ্ঞানিক হইয়াও তিনি ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ হারাইলেন না। হিন্দু-রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি একখানা প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহার নাম History of Hindu Chemistry—এই একখানা বই-ই তাঁহাকে ঐতিহাসিক হিসাবে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি বিলাতের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধি (ডি. এস-সি.) লাভ করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার সমসাময়িক আরও একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ঐ কলেজেই অধ্যাপনা করিতেন, তিনি আর কেহই নহেন—জগদীশচন্দ্র বসু। এই দুই বৈজ্ঞানিক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। দুই জনেরই এক সাধনা—বাঙ্গালীকে বিশ্বের গুণিসভায় আসন দিতে হইবে।

তাঁহাদের সেই সাধনা আজ সার্থক হইয়াছে, বাঙ্গালী আজ জগৎসভায় আসন লাভ করিয়াছে। আচার্য্যদেব তাঁহার ঐকান্তিক সাধনার বলে ভারতবর্ষে একদল প্রথম শ্রেণীর রাসায়নিক সৃষ্টি করিয়াছেন—যাঁহাদের সাধারণতঃ বলা হয় School of Bengali Chemists—বঙ্গীয় রাসায়নিক-মণ্ডলী।

তাঁহারা ভারতবর্ষের সকল জায়গায় ছড়াইয়া আছেন এবং বহু নবীন বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। ভারতবর্ষে আচার্য্যদেবের সকলের চেয়ে বড় দান—এই বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী সৃষ্টি।

বিজ্ঞান-সাধনার জন্য তিনি ছিলেন আজন্ম ব্রহ্মচারী, কিন্তু তিনি রহস্য করিয়া মাঝে মাঝে বলিতেন—"বিশ্ববিদ্যালয় আমার পত্নী আর ছাত্রেরা আমার পুত্র।" সত্য-সত্যই তিনি ছাত্রদের নিজের সন্তানের মত ভালবাসিতেন। তাহাদের জন্যই তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর ছাত্রসমাজও তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বিদায় লইবার সময় অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"তোমরা জান যে, আমি কখনও জাগতিক ধনসম্পত্তি খুব সাবধানে ব্যবহার করিনি।...যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, প্রেসিডেন্সি কলেজে এতদিন চাকুরীর পর আমি কী ধনদৌলত সঞ্চয় ক'রেছি—তা'হলে আমি ইতিহাসের কর্ণেলিয়ার (Cornelia) ভাষায় জবাব দেব। তোমরা নিশ্চয়ই কর্ণেলিয়ার গল্প জান। এক সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক তাঁর কাছে এসে গর্ব্বের সঙ্গে তাঁর ধনদৌলত কর্ণেলিয়াকে দেখাচ্ছিলেন এবং তাঁর কী সম্পত্তি আছে দেখাতে অনুরোধ করেছিলেন। তা'তে তিনি যে-পর্য্যন্ত না তাঁর ছেলেরা ফিরে আসে, সে পর্য্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। যখন ছেলেরা স্কুল থেকে এল, তখন

তাঁদের দেখিয়ে বল্লেন—এরা-ই আমার রত্ন। আমিও কর্ণেলিয়ার মত একজন রসিকলাল দত্ত, একজন নীলরতন ধর একজন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, একজন জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে দেখিয়ে বল্‌ব—এরাই আমার রত্ন।”

তিনি যে শুধু ছাত্র-সম্প্রদায়কেই ভালবাসিতেন তাহাই নয়, তিনি সমগ্র ভারতবাসীকে, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে, প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসিতেন। বাঙ্গালী জাতির দুর্দ্দশা, তাহার অর্থনৈতিক ও মানসিক অধঃপতনের চিন্তা তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। তাই তিনি বিগত অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালী জাতিকে চাকুরী ছাড়িয়া স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতে বলিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, তিনি নিজেকেই আদর্শ হিসাবে বাঙ্গালী জাতির সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ‘বেঙ্গল কেমিক্যাল’ প্রতিষ্ঠান আজ ভারতবর্ষে ঔষধের সর্ব্বপ্রধান স্বদেশী কারখানা। ইহা ছাড়া আরও শত শত বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন।

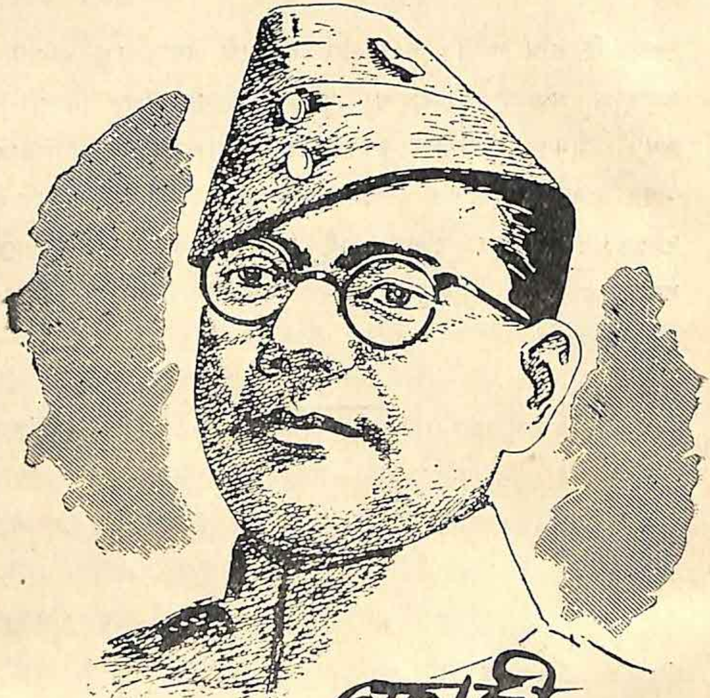
তিনি যেমন জাতি ও দেশকে ভালবাসিতেন, তেমনি উহার ত্রুটি-বিচ্যুতিরও তিনি অত্যন্ত কঠিনভাবে সমালোচনা করিতেন। তিনি বাঙ্গালী ছেলেদের ব্যর্থতায় দুঃখ করিয়া বলিতেন,—“এ দেশে নব্য যুবকগণ বহু অর্থ ও চশমা, চুরুট, চেন লইয়া বাজারে অবতীর্ণ হন। এই সকল যুবক দুগ্ধফেননিভ শয্যায় লালিত-পালিত। এই সুখময় কল্পনার জীবন হইতে

সহসা সংসারের কঠিন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া উহারা চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতে থাকে, কৃত্রিম বন্ধু ও ব্যবসায়ীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শীঘ্রই বাইবেলের সেই 'অমিতব্যয়ী পুত্রের' (Prodigal Son) ন্যায় পিতার চরণে আসিয়া উপস্থিত হয়।"

আচার্য্য রায় দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, বাঙ্গালী ছেলের প্রতিভা আছে, মেধা আছে, কিন্তু তাহা সুনিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় তাহার প্রকৃত ও স্বাভাবিক বিকাশ হয় নাই। যাহাতে বাঙ্গালী-প্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশ হয়, তাহার জন্য তিনি নিজের জীবন তিল তিল করিয়া ব্যয় করিয়াছেন, জলদগম্ভীর স্বরে জাতিকে ডাকিয়া সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—"আজ আমরা কালবারিধি-তীরে দাঁড়াইয়া শুধু কি উত্তাল তরঙ্গ গুণিয়া হতাশ মনে গৃহে ফিরিব?" আবার পরক্ষণেই সকলকে সাহস দিয়া বলিতেছেন,—"কঠিন সমস্যাসকলের মীমাংসা করবার ভার আমাদের হাতে—আমাদের কি দুর্ব্বলচিত্ত, চাকুরী-প্রিয় বিলাসী বাবু হওয়া সাজে? শক্ত হ'তে হবে, দৃঢ় হ'তে হবে, মেরুদণ্ডবিশিষ্ট মানুষ হ'তে হবে। অন্ন-সমস্যার মীমাংসা কর্‌তে পার্‌লে সঙ্গে সঙ্গে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাই ব্যবসায় ছাড়া আমার আর কিছুই বলবার নেই।"

উনিশ বৎসর পূর্ব্বে ত্যাগীশ্রেষ্ঠ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণে যে ১৬ই জুন তারিখটি চিরস্মরণীয় হইয়া আছে, ১৯৪৪ সালের সেই পুণ্য-পবিত্র দিনে ভারতের বিজ্ঞান-সাধনার

শ্রেষ্ঠ পীঠভূমি কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আর্ত্তবন্ধু আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হয়। নিমতলা মহাশ্মশানে বিশ্বকবির চিতাপার্শ্বে আচার্য্যদেবের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হইয়াছে। বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী যুগযুগ ধরিয়া এই মহাপুরুষকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিবে, তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া গৌরব বোধ করিবে।



নেতাজী সুভাষচন্দ্র

মুক্তি-যুদ্ধের বীর সেনানী

১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী।

কংগ্রেস-ঘোষিত পুণ্য-পবিত্র স্বাধীনতা দিবস। ভারতের আকাশে সেদিন বুঝিবা দ্বাদশ সূর্য্যের উদয়। তাই বড় উজ্জ্বল,

বড় মহিমময় ভারতের পূর্ব্ব দিগন্ত। প্রভাতসূর্য্য নূতন করিয়া ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে জাগাইয়া দিয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্র কত শত নরনারী সেদিন আর একবার নূতন করিয়া স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করিবে। দিকে দিকে সেদিন উৎসাহ উদ্দীপনা, আশার নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে ভারতবাসীর হৃদয়।

ইহার মধ্যে অকস্মাৎ শুনা গেল,—সুভাষচন্দ্র তাঁহার গৃহ হইতে রহস্যজনকভাবে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছেন। কিন্তু ইহা সম্ভব হয় কিরূপে? অন্তর্হিত হইবার অল্প কয়েকদিন আগে তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া স্বগৃহে আটক রাখা হইয়াছিল ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়ার দরুণ। ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দারা তাঁহার এলগিন রোডের বাড়ীর চারিদিকে কড়া পাহারায় ছিল। তাহাদের সতর্ক দৃষ্টিকে এড়াইয়া সুভাষচন্দ্র কোথায় যাইতে পারেন? অতগুলি সতর্ক গোয়েন্দার দৃষ্টি এড়াইয়া সুভাষচন্দ্র অন্তর্হিত হইয়াছেন, ইহা যে কল্পনাতীত! তাই গোয়েন্দারা সুভাষচন্দ্রের বাড়ীর ভিতর, বাড়ীর বাহির সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুজিল। অবশেষে সারা কলিকাতার পুলিশ, এমন কি—সারা ভারতবর্ষে ইংরাজ সরকারের পুলিশ ও গোয়েন্দাদের দৃষ্টি সতর্ক হইয়া উঠিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কোন সন্ধান তাহাদের সন্ধানী দৃষ্টি পাইল না।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন বার্লিন রেডিও হইতে শুনা গেল—“বিগত দুইশত বৎসরের বৈদেশিক ইতিহাস আমি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছি,—বিশেষতঃ স্বাধীনতা-

সংগ্রামের ইতিহাস। কিন্তু কোথাও বৈদেশিক সাহায্য না লইয়া কোন দেশ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে এরূপ একটি দৃষ্টান্তও আমি পাই নাই। এমন কি ব্রিটেনও তাহার নিজের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আজ শুধু যে স্বাধীন জাতির সাহায্য গ্রহণ করিতেছে এমন নয়, পরন্তু ভারতের মত পরাধীন দেশের সাহায্যও গ্রহণ করিতেছে। এইরূপ সাহায্য ভিক্ষায় যদি ব্রিটেনের কোন দোষ না থাকে, তবে ভারতের পক্ষে তাহার স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য বিদেশের সাহায্য গ্রহণ করায় কোন দোষ আছে বলিয়া আমি মনে করি না। সুতরাং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আমরা সর্ব্ব-প্রকার সাহায্যই সাদরে গ্রহণ করিব।”—এই ঘোষণা কাহার, ইহা সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর না? দেশবাসী কৌতূহলী হইয়াছিল, সুভাষচন্দ্র কোথায় গেলেন ইহা চিন্তা করিয়া। ইংরাজ সরকার, পুলিশ গোয়েন্দারাও কৌতূহলী ছিল। এই ঘোষণার পর সকলেই জানিলেন যে, চিরবিদ্রোহী সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ হইতে মুক্ত করার জন্য দেশ ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটিশের শত্রু জার্ম্মানীর সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন। বুঝা গেল যে, ভারতীয়দের লইয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তিনি এমন অংশ গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর যাহাতে ঐ যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ ইংরেজের বন্ধন-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি কোন বৈদেশিক শক্তির সাহায্য গ্রহণ করা অযৌক্তিক বলিয়া মনে

করেন নাই। স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন ও রক্ষার জন্য বিদেশী শক্তির সহায়তা গ্রহণের নজির ইতিহাসে অসংখ্যই রহিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়া ও নাৎসী জার্ম্মানীর মধ্যে যদি মৈত্রী চুক্তি সম্ভব হইতে পারে, তবে স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষ ইংরেজের শত্রুর পক্ষে যোগ দিয়া ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে তাহাতে দোষ কোথায়?

বার্লিনে হিটলারের সাহায্যে সুভাষচন্দ্র আধুনিক রণবিজ্ঞান শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ পাইলেন এবং স্বয়ং বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া সংগ্রাম পরিচালনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন।

১৯৪২ সালের ২৬শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়ায় আটক ভারতীয় এবং জার্ম্মান বাহিনীর হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করিলেন। প্রায় আটাশ হাজার ভারতীয় এই বাহিনীতে যোগ দেয় এবং জার্ম্মান সৈন্যদের সঙ্গে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির বিরুদ্ধে ইহারা কৃতিত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে। জার্ম্মানীর ন্যায় ইতালীতেও সুভাষচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় আর একটি আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গড়িয়া উঠে। কিন্তু ইতালীয় সেনাপতিদের সঙ্গে ইতালীয় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নায়কদের মতান্তর হওয়ায় কিছুকাল পরে ভারতীয় সেনানায়কগণ ইতালীয় ফৌজ ভাঙ্গিয়া দেন। ইহার পরে জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া হইতে বীরবিপ্লবী রাসবিহারী ও অন্যান্য প্রবাসী ভারতীয়দের আহ্বানে সুভাষচন্দ্র টোকিও চলিয়া যান।

ভারতীয় নেতৃবর্গ ও ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্র বার বার আহ্বান জানাইতে থাকেন ইংরেজের বিরুদ্ধে আপোষহীন বিরামহীন সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার জন্য। ১৯৪২ সালের আগষ্ট বিপ্লব সুরু হইলে তিনি ভারতীয় জনগণকে অভিনন্দনও জানাইয়াছিলেন। অন্যায় ও অবিচারের সঙ্গে কখনও আপোষ হইতে পারে না, সুভাষচন্দ্র ইহা অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করিতেন। অন্যায়ের ও অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কল্যাণ-ব্রত তিনি গ্রহণ করেন কিশোর বয়সে এবং তাঁহার এই সঙ্কল্পের কথা তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। ছোটবেলা হইতেই জাতীয় অপমানকে তিনি ব্যক্তিগত অপমান বলিয়া মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কলেজ-জীবনের একটি ঘটনায়ই প্রথম প্রকাশ পায় যে, বিদ্রোহী ভারত একদিন এই সুভাষচন্দ্রকেই 'নেতাজী' হিসাবে বরণ করিয়া লইবে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে স্মরণ করিতে সেই দিনের সেই ঘটনাটিও মনে পড়ে। ঘটনাটি এই ঃ

এত হট্টগোল কিসের ?

সেরা সরকারী কলেজ। মেশিনের মত সুশৃঙ্খলভাবে সব মানুষ যেখানে চলাফেরা ও কাজকর্ম্ম করে সেখানে ছাত্র-শিক্ষক সকলের সমবেত হৈ-চৈ, এদিক-ওদিক ছুটাছুটি ! কি ব্যাপার ? কলেজের সম্মুখে আবার একদল পুলিশও আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নিশ্চয়ই বড় রকমের একটা কোন ঘটনা ঘটিয়া গিয়া থাকিবে।

রাজপথে জনতার ভীড়। এ ওকে প্রশ্ন করে, কি হইয়াছে; কিন্তু কেহই কাহাকেও সঠিকভাবে কিছু বলিতে পারে না। ইতিমধ্যে একটি ছাত্র বাহির হইয়া আসে কলেজ প্রাঙ্গণ হইতে। চোখে মুখে তাহার তীব্র উত্তেজনার ভাব। রাস্তায় নামিয়া আসিতেই জনতা তাহাকে ঘিরিয়া ধরে। চতুর্দ্দিক হইতে একই প্রশ্ন, "কিসের গোলমাল?"

অল্প কয়েকটি কথায় ছাত্রটি উত্তর দেয়, "ওটেন সাহেব বাঙ্গালী ছাত্রদের এবং সমগ্র বাঙ্গালীকে উদ্দেশ্য করে আপমানকর কথা বলেছিলেন, আমরা সমুচিত জবাব দিয়েছি। সুভাষ শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপককে বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তরুণ বাংলা আজ জাগ্রত, বাংলার যুবক নীরবে আর বিদেশীর কাছে বাঙ্গালীর অথবা কোন ভারতীয়ের অপমান সহ্য করবে না।"

এই কয়টি কথা বলিয়াই ছাত্রটি দ্রুতপদে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। জনতার আগ্রহও অনেকটা প্রশমিত হয় তাহার উত্তরে। বাঙ্গালীর অপমানের যে সমুচিত জবাব দেওয়া হইয়াছে, ইহা জানিয়া সকলেই খুশি। ছাত্রমহলে কিন্তু এই ঘটনায় বেশ একটু বিস্ময়েরও সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার কারণ প্রধানতঃ এই যে, সুভাষচন্দ্র শিক্ষকদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এবং তাঁহার বিনীত ও সুমধুর ব্যবহারে অধ্যাপকবর্গ সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। কাজেই তাঁহার নেতৃত্বে অধ্যাপক ওটেন সাহেব সমুচিত শিক্ষা পাইবেন, তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই।

এই ঘটনার পরে সুভাষচন্দ্রকে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয় এবং তাঁহার শিক্ষালাভের পথে কিছু ব্যাঘাতও ঘটে। সুভাষচন্দ্রের পরবর্ত্তী জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আমরা এই দৃষ্টান্তেরই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই। বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তিনি তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ বিপদ-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, নিজেকে বাঁচাইয়া চলিবার প্রশ্ন মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মনে আসে নাই।

কলিকাতায় এম. এ. পড়িবার কালে পিতা জানকীনাথের পীড়াপীড়িতে আই. সি. এস. হইবার জন্য সুভাষচন্দ্রকে বিলাতে যাইতে হয়। কিন্তু হাকিম হইয়া বিদেশী শাসনকে কায়েম রাখিবার জন্য যিনি নির্দ্দিষ্ট নন তাঁহার কাছে আই. সি. এস.-এর ঔজ্জ্বল্য সম্মানের নহে, বিড়ম্বনা মাত্র। পিতৃ-আজ্ঞায় তিনি মাত্র আট মাসের চেষ্টায় আই. সি. এস. পরীক্ষা দিয়াছিলেন এবং সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ-জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয় মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা না করিয়া সুভাষচন্দ্র অতি লোভনীয় আই. সি. এস. পদে ইস্তফা দিলেন পরিপূর্ণভাবে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগের উদ্দেশ্যে এবং সেই সঙ্কল্প লইয়াই তিনি ইংল্যাণ্ড হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

দেশে আসিয়া প্রথমেই সুভাষচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহারই উপদেশ অনুসারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বিশ্বস্ত সহকারী হিসাবে অসহযোগ আন্দোলনে

ঝাঁপাইয়া পড়েন। তখন হইতে বারংবার কারাবরণে, নির্ব্বাসনে ও অন্যান্য বহুবিধ সরকারী নির্য্যাতনে সুভাষচন্দ্রকে দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু শত লাঞ্ছনা তাঁহাকে দেশসেবার পবিত্র আদর্শ হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করিতে পারে নাই। উত্তর বঙ্গের বন্যার্ত্তদের ত্রাণকার্য্যে, স্বরাজ্যদলের মুখপত্র 'ফরোয়ার্ড' ও 'বাংলার কথা' পরিচালনায়, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ও পরে মেয়ররূপে এবং সামরিক শৃঙ্খলাপরায়ণ বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রতিষ্ঠায় সুভাষচন্দ্র যে সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় দেন, তাহা ছিল বৃটিশ সরকারের বিশেষ উদ্বেগের কারণ। স্বাস্থ্যোদ্ধারে ইউরোপে যাইয়া তিনি সেখানে স্বাধীনতাকামী ভারতের হইয়া যে প্রচারকার্য্য করেন, সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি তাহাতে ভারতের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। বিদেশে জাতীয় কংগ্রেসের বাণী প্রচারের আবশ্যকতার উপর তিনিই প্রথম জোর দেন।

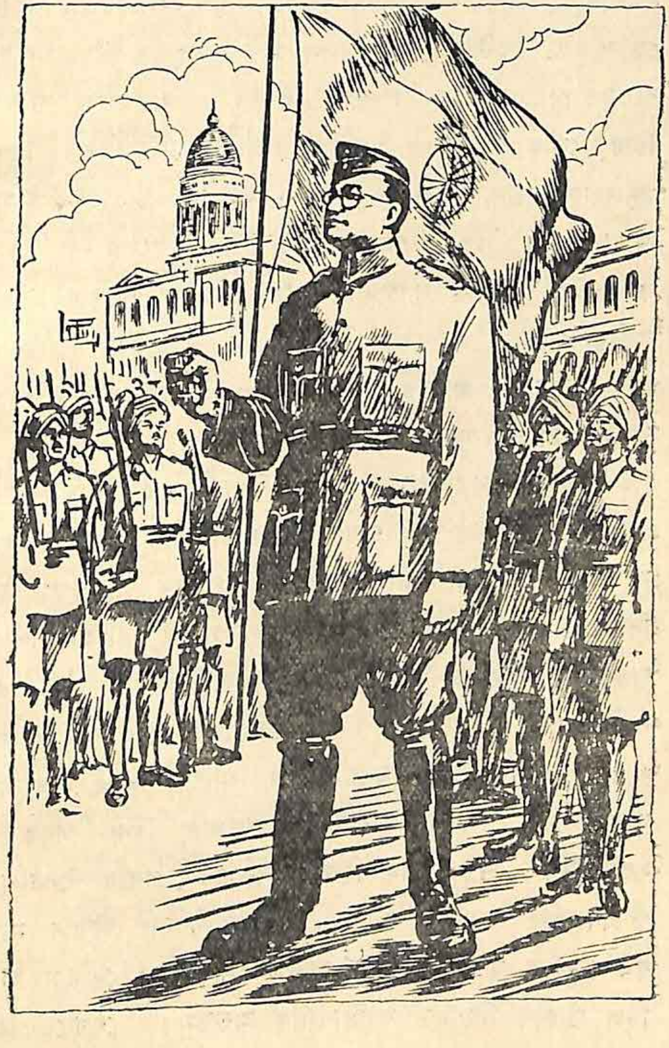
১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেন যে, বিদেশী গভর্ণমেণ্ট ও পরাধীন জাতির মধ্যে কোনরূপ আপোষ চলিতে পারে না। এ সময়ে সমগ্র ভারতের হৃদয়-রাজ্যে সুভাষচন্দ্রের প্রভাব ছিল অপরিসীম। তাই উহার পর বৎসরেও তিনি পুনরায় কংগ্রেস-সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। মহাত্মা গান্ধী ও দক্ষিণপন্থী নেতাদের পূর্ণ সমর্থন সত্ত্বেও ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বহু

ভোটে পরাজিত হন। কিন্তু নেহেরু-প্যাটেল প্রমুখ নেতৃবর্গের সহযোগিতা না পাওয়ায় সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস-সভাপতির পদ শেষ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে একটি নূতন দল গঠন করেন। 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে একটি নূতন সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্রিকাও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। এই পত্রিকায় লিখিত তাঁহার একটি প্রবন্ধের জন্য সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনীত হয় এবং তাঁহার দেশত্যাগী হইবার দীর্ঘকাল পরেও আদালতে এই মামলার শুনানী চলে।

জাতীয় নেতা হিসাবে সুভাষচন্দ্রের বহু কার্য্যই মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তাহার মধ্যে দেশের শিল্প-বাণিজ্য উন্নয়নে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি স্থাপন, কংগ্রেসের বৈদেশিক দপ্তর প্রতিষ্ঠা এবং বিদেশে ভারতীয় শুভেচ্ছা মিশন প্রেরণ ইত্যাদি কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁহার জীবনে আর একটি স্বপ্ন-সাধ ছিল। সমস্ত নির্য্যাতিত দেশকর্ম্মীর আশ্রয়স্থলরূপে তিনি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন 'মহাজাতি সদনে'র। ১৩৪৬ সালের ২রা ভাদ্র বিশ্বকবি রবীন্দ্র-নাথ 'মহাজাতি সদনে'র ভিত্তি স্থাপন করেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে এই মহৎ প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ-ই রহিয়া গিয়াছে।

সুভাষচন্দ্রের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বীরত্বপূর্ণ ও মহত্তম অধ্যায় সিঙ্গাপুরে ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর অস্থায়ী স্বাধীন ভারত



সরকার প্রতিষ্ঠায় এবং তাঁহার অধীনে সুসংবদ্ধ আজাদ হিন্দ ফৌজ লইয়া ব্রিটিশ শক্তির উচ্ছেদ কল্পে সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনায়। সুভাষচন্দ্রের অসামান্য ব্যক্তিত্বে ও গভীর আন্তরিকতায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সর্ব্বজাতির মিলনক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান, শিখ সকল লোকই ছিল তাঁহার সেনাবাহিনীতে, কিন্তু এমনই ভাবে তিনি সকলের মন হইতে বড়ছোটর গণ্ডি ও সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া চূরমার করিয়া একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সকলকে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন যে, কে কোন্ জাতির লোক বা কে ছোট কে বড় তাহা কখনও কাহারও মনেই আসিত না।

নেতাজীর নামে শুধু আজাদ হিন্দ্ ফৌজ বা ভারতবাসী কেন, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াইলেও তাঁহার মধ্যে কোন নেতৃত্বাভিমান বা অহঙ্কার ছিল না। সিঙ্গাপুরে এক দিন তাঁহার জন্য আহার্য্যের একটু বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্র ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিলেন ঃ "সৈন্যরা যে খাবার খাবে আমিও তাই খাব। তাদের সঙ্গে আমায় কখনো আলাদা করে দেখো না। তারাও যা, আমিও তাই।" আজাদ হিন্দ্ সরকারের সর্ব্বাধিনায়ক ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রধান সেনাপতি সুভাষচন্দ্রের দৈনন্দিন জীবনে এইরূপ ঘটনার অভাব নাই। হাসপাতালে যাইয়া প্রত্যহ আহত সৈনিকদের দেখিয়া আসা ছিল তাঁহার নিয়মিত কার্য্যাবলীর অন্যতম। সেখানে তিনি

ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকটি রোগীর খোঁজ খবর লইতেন। একদিন তাঁহার চোখে পড়িল, একটি আহত সৈন্য শীতে কাঁপিতেছে, অথচ তাহার গায়ে সামান্য একটা গেঞ্জি ছাড়া আর কিছুই নাই। নেতাজী অবিলম্বে তাঁহার নিজের গায়ের মূল্যবান কোটটি খুলিয়া লইয়া নিজ হাতে ঐ সৈনিককে পরাইয়া দিলেন। দেশের মুক্তির জন্য সুভাষচন্দ্রের অঙ্গুলি হেলনে লক্ষ লক্ষ লোক যে কেন আত্মদানের ব্রত লইয়াছিল, এই সব দৃষ্টান্ত হইতেই তাহার সন্ধান মিলে। নেতাজীর নির্দ্দেশে আজাদী সৈন্যরা শত্রুবাহিনীকে হঠাইয়া দিয়া যেদিন ভারতভূমিতে পদার্পণ করিয়া সমবেত কণ্ঠে দেশমাতার বন্দনা করিল এবং মণিপুরের মাটিতে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা প্রথম উড্ডীন করিল তখন কোন ভারতবাসী না তাহার অন্তরে বিদ্যুৎ-শিহরণ অনুভব করিয়াছে? রসদ ও সমরোপকরণের অভাবে এবং প্রবল বারিপাতের দরুণ আজাদী বাহিনী সে সময় চূড়ান্ত সাফল্য অর্জ্জনে ব্যর্থ হইলেও যে স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি তাহার মূলে সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর দানকে ছোট করিয়া দেখিবার উপায় নাই।

ইম্ফলে এবং পরে ব্রহ্মযুদ্ধে ভাগ্য বিপর্য্যয়ের পর নেতাজী ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে রেঙ্গুণ ত্যাগ করিয়া ব্যাঙ্ককে তাঁহার প্রধান হেড কোয়ার্টার স্থাপন করেন। কিছুকাল পর ২৩শে আগষ্ট হঠাৎ এক সংবাদ প্রচারিত হয় যে, ১৮ই আগষ্ট এক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! এই

দুঃসংবাদ ভারতবাসী স্তব্ধ-বিস্ময়ে শুনিয়াছে মাত্র, বিশ্বাস করে নাই।

বীরের মৃত্যু নাই। নেতাজী সুভাষচন্দ্র অমর। তাঁহার 'জয় হিন্দ' মন্ত্র অবিনশ্বর। সমগ্র ভারত আজ একান্তমনে এই কামনাই করে—

"তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর পূর্ণ করো।"

২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ৪-এ, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ইউনিয়ন প্রেস হইতে শ্রীরামচন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।